প্রতীতি

পরিবেশ ও ইতিহাস বিষয়ক
ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ সংকলন

প্রতীতি

বিষয় : পরিবেশ ও ইতিহাস

৩

সম্পাদনা

রাহুল রায়

প্রতীতি

নারকেল বাগান, খাগড়াজোল
পোস্ট : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি
পিন : ৭১২১০১

সূচি

পরিবেশ

পরিবেশ চিন্তার উদ্যোগ পর্ব (বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ)
সত্যসৌরভ জানা ১
বর্জ্য প্লাস্টিকের পুনরাবর্তন
সত্যেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ৬
দামোদর : বাঁধ নির্মাণের একাল ও সেকাল
কুমকুম ভট্টাচার্য্য ২১
ভদ্রেশ্বর শহরে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের অনুভাব্য সীমা — একটি কল্যাণ বিষয়ক সমীক্ষা
ভাস্কর চোংদার ৪৭
মানুষ - প্রকৃতি সম্পর্ক, মানবিক বাস্তব্যবিদ্যা এবং আগামী গতিপথ
রাহুল রায় ৫৬

ইতিহাস

'নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' ?
গৌতম নিয়োগী ৬৯
সম্রাট অশোকের সমদর্শিতা
সুজিত কুমার আচার্য ৭৯
রামমোহন চর্চা ও সুমিত সরকার
প্রসঙ্গ : অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ
রমেন্দ্র মিত্র ৮৯
বিজ্ঞানের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরি
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১১১
কথায় কথায় ডিরোজিও-র ঠাকুর্দা
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ১১৬
আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক
পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩
ভূগোল চর্চায় বিশ্বকোষী ধারা
মৃদুলা নিয়োগী ১৪৫
ইতিহাসে ধর্ম
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ১৫৬
মহানগরীয় জঞ্জাল অপসারণ : একটি গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন
আলোচনা : শুক্লা ভাদুড়ী ১৬৩

নিবেদন

প্রতীতি – ৩ প্রকাশিত হল। এ বারের সংখ্যাটি তিনটি পর্বে সাজানো। প্রথম পর্বে রয়েছে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা, দ্বিতীয়টিতে ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলি এবং শেষ পর্বে রয়েছে পুস্তক আলোচনা। প্রবন্ধকারেরা তাঁদের মননধর্মী প্রবন্ধাবলিতে প্রতীতি-র ব্যতিক্রমী প্রকৃতি বজায় রেখেছেন। এখানে সে বিষয়ে কোনওরকম উল্লেখ অনাবশ্যক। প্রবন্ধকারদের রচনাই তাঁদের ব্যতিক্রমী মননধর্মিতার প্রকৃতি চিনিয়ে দেবে। এবং প্রতীতি অবশ্যই চেষ্টা করবে এই ধরনের রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করে যেতে।

প্রতীতি-র অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অরবিন্দ বিশ্বাস গত ২৬ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর শূন্যতা অপূরণীয়। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। প্রতীতি-র আগামী সংখ্যা হবে তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে এক বিনম্র নিবেদন।

রাহুল রায়

দামোদর : বাঁধ নির্মাণের একাল ও সেকাল

কুমকুম ভট্টাচার্য্য

প্রাক্‌কথন

প্রাচীন সভ্যতাগুলি নদনদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল একসময়ে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস অববাহিকায় সুমেরীয় সভ্যতা, সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, সরস্বতী নদী তীরে বৈদিক সভ্যতা, হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং (বর্তমানে Changziang) নদী দুটির তীরে চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকালে আদিম যাযাবর জাতি তাদের কৃষি-চারণ (peasant-pastoral) সংস্কৃতি ছেড়ে কেন যে শহুরে সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়েছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও এ কথা সত্য যে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মাটি, প্রয়োজনীয় জল ও কৃষিকার্যের সুবিধাগুলি তাদের আকৃষ্ট করেছিল। সেই সময় নদী উপত্যকাগুলি নিশ্চয়ই জঙ্গলে ভর্তি ছিল এবং বন্যাপ্রবণও ছিল। প্রায় এগারো হাজার বছর আগে সেখানে ক্রমশ হয়তো জলবায়ু পরিবর্তিত হয়েছিল। আবহাওয়া ক্রমশ শুষ্ক হয়েছিল। কারণ হিমবাহ ক্রমশ উত্তর দিকে সরতে শুরু করেছিল। মানুষের জীবনযাত্রাও কঠোর হতে থাকে সেই সময়ে। আদিম যাযাবর জাতি সরতে থাকে নদী উপত্যকার দিকে। নদীর বন্যা প্রবণতা তাদের অনুপ্রানিত করে। তারা নদী অনুশাসন করতে শুরু করে। একে একে গড়ে তোলে কৃত্রিম বাঁধ, খাল, বাঁধ ও জলাধার ইত্যাদি।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে দেশের সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রথমেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নদী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়। এই বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির সুফল হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পে জল সরবরাহ, জলপথ পরিবহন ও মৎস্য চাষ প্রভৃতি। পরিকল্পনার বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনাকালে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—প্রথমত, ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি ভ্যালি অথরিটি গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ সালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা ভারতের National Institute of Science -এ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নদী পরিকল্পনার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ড: মেঘনাদ সাহার ধারণা সার্থক রূপ পায় ঠিক স্বাধীনতার পরবর্তী কালে। টেনিসি ভ্যালি প্রকল্পের অনুসরণে ১৯৪৮ সালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প বা ডিভিসি গঠিত হয়। তার পরবর্তী কালে একে একে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বড় নদীর ক্ষেত্রে। সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে যে এই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে অর্থাৎ বাঁধগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও অন্যান্য সুফলগুলি প্রদানে কতটা কার্যকর হতে পেরেছে। প্রশ্ন উঠেছে যে বাঁধগুলিই এখন বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও প্রশ্ন উঠেছে যে সেচের জল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, বাঁধ নির্মাণের ফলে বহু জমি জলের তলায় চলে যাচ্ছে, প্লাবিত হচ্ছে বহু গ্রাম ও নগর, জলমগ্ন হচ্ছে বহু অরণ্য, বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে বহু মানুষ। প্রস্তাব এসেছে বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করা হোক।

এত প্রশ্ন সত্ত্বেও বহুমুখী নদী পরিকল্পনাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। সম্প্রতি বাঁধের বিশ্ব আয়োগ (World Commission of Dams) সুপারিশ করেছেন যে প্রতি পাঁচ থেকে দশ বছর অন্তর বাঁধের উপযোগিতা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও কার্যকারিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বর্তমান বড় বাঁধগুলির পুনর্জীবন ও উন্নতিকল্পে বাঁধগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলির সর্বাধিক উপযোগীকরণকল্পে বিশ্ব আয়োগের চিহ্নিত করা কর্মসূচির রূপায়ণ আবশ্যক (WCD, 2000, River Revival. 2000)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধগুলির মূল্যায়ন খুবই সময়োপযোগী।

দামোদর নদ এক বৈচিত্র্যের প্রতীক। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক নদনদীর ক্ষেত্রেই এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। দামোদরের বন্যাকে হোয়াংহোর বন্যার সঙ্গে তুলনা করা যেত যদিও এই

নদী আয়তনে অনেক বড়। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত মাত্র ৫৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ দামোদর নদ। নদীমাত্রিক ভারতের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় অত্যন্ত ছোট। এই দামোদর নদেই জমিদারদের আমলে তৈরি বাঁধ দেখা যায়। এই নদেই প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়। এই নদবক্ষেই এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই দামোদর তাই এক স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

দামোদর নদ : ভৌগোলিক পটভূমিকা

দামোদর নদের উৎস হল বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ছোটনাগপুর মালভূমির পালামৌ-এর খামারপত পাহাড়ে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬১০ মিটার উচ্চতায়। এই নদ দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২৮৯.৭ কিলো-মিটার প্রবাহিত হওয়ার পর রানিগঞ্জের কাছে পশ্চিমবঙ্গে সমভূমিতে এসে মিশেছে। বর্ধমানের কাছে শক্তিগড়ে প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে দামোদর কলকাতা থেকে ৪৮ কিলোমিটার নিচে ফলতার বিপরীতে হুগলি নদীতে মিশেছে (চিত্র - ১)। বামগড়ের কাছে রাজরাপ্পায় পাহাড়ি নদী ডেরি দামোদরে এসে মিশেছে। কিছু পথ চলার পর কোনার ও বোকারো এসে মিশেছে দামোদরে। দিশেরগড়ের কাছে প্রধান উপনদী বরাকর-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে দামোদর। হাজারিবাগ সাঁওতাল পরগণার উস্রি, টানরো, রাজোয়া, ক্ষুদিয়া নামে নদীগুলি বরাকরেরই উপনদী।

দামোদরের মোট অববাহিকার আয়তন ২৪,২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এর দুই তৃতীয়াংশই পড়ে উচ্চ অববাহিকায়। নিম্ন অববাহিকায় পড়ে মাত্র এক তৃতীয়াংশ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় দামোদরের অববাহিকার বৈশিষ্ট্যর জন্যই এই নদ এক বৈচিত্র্যের প্রতীক। উচ্চ অংশে দামোদর প্রবাহিত হচ্ছে গ্রানাইট নিস্ নামক কঠিন সুপ্রাচীন শিলার মধ্য দিয়ে। তারপরে দামোদর প্রবাহিত হয়েছে গন্ডোয়ানা যুগের বেলে পাথরের উপর দিয়ে। উৎস অঞ্চলে দামোদরের খাত খুবই অসমান ও উঁচু নিচু। নিম্নগতিতে দামোদর বইছে পুরু পলি গঠিত প্রায় সমতল ঢালবিহীন ভূমির উপর দিয়ে। পাহাড় থেকে বয়ে আনা বালি পলিকে বইতে না পেরে সঞ্চয় করেছে নদীর খাতে। দামোদর অববাহিকায় সারা বছরের মোট বৃষ্টির প্রায় নব্বই শতাংশই ঘটছে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে। দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় মৌসুমি নিম্ন চাপের দরুন বৃষ্টি হয় প্রথমেই। নিম্ন অববাহিকায় বৃষ্টি হওয়ার পরে ঘূর্ণি ঝড়গুলি সরে যেতে থাকে উত্তর-পশ্চিমে দামোদরের উচ্চ অববাহিকায়। ওই অংশে অববাহিকার আয়তন ও ঢাল অনেক বেশি হওয়ায় বিপুল পরিমাণ জলরাশি দামোদরের বিভিন্ন উপনদী মাধ্যমে নিম্ন অববাহিকায় এসে পড়ে। নিম্ন অববাহিকার জল নিষ্কাশনের আগেই উচ্চ অববাহিকার জল এসে পড়ায় নিম্ন দামোদরের বন্যার তীব্রতা বেড়ে যায়।

দামোদরের পথ পরিবর্তন

বন্যার জন্য দামোদর বিগত কয়েক শতাব্দীতে তার গতিপথকে বারবার পরিবর্তিত করেছে। তার পরিত্যক্ত খাতগুলি হল খাঁড়ি, বাঁকা, বেহুলা, গাঙুর, কানা দামোদর ইত্যাদি (চিত্র - ২)।

ডি. ব্যারোস (১৫৫০)-এর মানচিত্রে দামোদরের প্রধান প্রবাহ কানা দামোদর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উলুবেড়িয়ার কাছে হুগলিতে পড়েছিল। ভ্যানডেন ব্রোকের (১৬৬০) মানচিত্রে দামোদরের প্রধান শাখা বর্ধমানের কাছ থেকে পূর্বমুখী হয়ে গাঙুর ও বেহুলা নাম নিয়ে কালনার কাছে ভাগীরথীতে মিশেছিল। বাঁকা এই সময় সক্রিয় ছিল। বর্ধমান শহরের সমৃদ্ধিতে বাঁকা নালার অবদানও কিছু কম ছিল না। ১৭৭০ সালে এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পূর্বমুখী বেহুলার পথ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং প্রধান শাখাটি ফলতার কাছে হুগলি নদীতে এসে মিলিত হয় (সেন, ১৯৬২, ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। দক্ষিণ দিকে আসার সময় শক্তিগড়ের কাছে দামোদর প্রায় সমকোণে বাঁক নেওয়ায় এবং পথটি সুদীর্ঘ হওয়ায় আজও দামোদর তার এই দক্ষিণের পথটিকে কেটে নিতে পারেনি। ১৮৬৫ সালে এই নদই আবার নতুন পথ খুঁজে নেয়। হুগলি ও হাওড়া জেলার দামোদর বা আমতা খাত নামক পথটি পরিবর্তিত করে চলে মুণ্ডেশ্বরীর

পথে। দামোদরের এই শেষ পথ পরিবর্তনের জন্য মানুষ কিছুটা দায়ী। জামালপুর থানার মুইদিপুরে ১৮৫৬ সালে দামোদর থেকে একটি ৬ মিটার চওড়া খাল কাটা হয়। এর নাম মুচি খাল। উদ্দেশ্য ছিল দামোদরের পশ্চিম পাড়ের রেললাইন, পাড়বাঁধ সহ বিস্তীর্ণ জনপদকে দামোদরের বন্যার হাত থেকে বাঁচানো। দামোদরের কিছু জলপ্রবাহ এই পথে প্রবাহিত করলে দামোদরের বাঁধ রক্ষা পাবে এবং মূল নদেতে জলের চাপও কম হবে। এই মুচিখাল ভাঙতে ভাঙতে মূল নদে পরিণত হয় এবং মূল দামোদর শীর্ণ হতে শুরু করে। এই খালের নিচে একটি বাঁধ দিয়ে খালটিকে তখন বাঁধা হয়। এই বাঁধটি ভেঙেই বেগুয়াহানার উৎপত্তি হয় ও জলরাশি বেগুয়াহানা দিয়েই প্রবাহিত হতে শুরু করায় নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহ বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। এই বেগুয়াহানা সুরে কালনা থেকে হুগলি জেলায় প্রবেশের পর মুণ্ডেশ্বরী নামে পরিচিত হয়েছে। ১৯৯৯-এর IRS Geo-code Imagery-তে দেখা যাচ্ছে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে কিছু চরা গজিয়ে ওঠায় শুখা মরশুমে আমতা খাত দিয়ে একটু বেশি জলই প্রবেশ করছে (চিত্র - ৩)। বর্তমানে মুণ্ডেশ্বরী ও আমতা খাতে জলপ্রবাহের ভাগ হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ৭০ ভাগ ও ৩০ ভাগ (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০)। আমতা খাতের জল নির্গমন ক্ষমতা হল ৮৪৯.৬ কিউমেক (৩০,০০০ কিউসেক) এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল নির্গমন ক্ষমতা হল ২৮৩২ কিউমেক অর্থাৎ ১,০০,০০০ কিউসেক। অনুকূল অবস্থায় দুর্গাপুর ব্যারেজ-এর নিচে জল নির্গমন ক্ষমতা যদিও ৩৬৮১ কিউমেক (১,৩০,০০০ কিউসেক) ধরা হয় (রেগুলেশন ম্যানুয়াল, ২০০১), কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে মাটি যখন সুসিক্ত থাকে,ভূগর্ভের জলের স্তর পরিপূর্ণ থাকে, অতিবৃষ্টির জন্য দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণও ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং জোয়ারও লক্ষ করা যায়, ডিভিসি জলাধার থেকে ২৮৩২ কিউমেক (১,০০,০০০ কিউসেক) জল ছাড়া হলেই নিম্ন দামোদরে তখন প্লাবন দেখা যায়, (সেন, ১৯৮৫, ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)।

দামোদরের বন্যার ইতিহাস ও তার নিয়ন্ত্রণ : একাল ও সেকাল

দামোদরের বিধ্বংসী বন্যার জন্য এই নদের পরিচিতি ছিল 'দুঃখের নদ' বলে। হান্টার সাহেব তাঁর ১৮৭৬-এর রিপোর্টে বলেছেন যে দামোদরের হঠাৎ বন্যা বড় মারাত্মক ছিল। এই ধরনের বন্যাকে 'হড়কা বান' বলা হত। দামোদরের জল বন্যার সময় স্তূপাকারে প্রায় ১.৫ মিটার উঁচু হয়ে বিনষ্ট করত বহু গ্রাম নগর ও কৃষিখেত (হান্টার, ১৮৭৬)। হান্টার সাহেবের বহুপূর্বে এক তরুণ ধর্মোপাসক ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে "দামোদরের বন্যা" শীর্ষক একটি কবিতায় সেই সন হাজার বাহাত্তর (১০৭২)-এর প্রথম আশ্বিনের অর্থাৎ ইংরাজি ১৬৬৫ সালের বন্যার উল্লেখ করেন (মিত্র,১৯৪৬)। যদিও রেকর্ড অনুযায়ী দামোদরে প্রথম বন্যা হয়েছে ১৭৩০ সালে (ভুরডুইন, ১৯৪৭)। ১৭৩০ থেকে প্রায় প্রতি আট দশ বছর অন্তর অন্তর বিভিন্ন জলপ্রবাহের বন্যা এসেছে দামোদরে। প্রায় ৮৪৯৬ কিউমেকের সর্বোচ্চ প্রবাহ এসেছিল ১৮২৩, ১৮৪০, ১৮৫৫, ১৮৬০, ১৮৬৪, ১৮৬৫, ১৮৬৬, ১৮৭৭, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯৩৫, ১৯৩৪, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৬, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৭৮ সালে। ১৮২৩, ১৮৪০, ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৭৮ সালে প্রবাহ এসেছিল ১৬,৯৯২ কিউমেক। ১৯১৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪১-এ সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ এসেছিল প্রায় ১৮,৬৭৮ কিউমেক (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। বর্তমান শতাব্দীতে ১৯৭৮-এর বন্যা সর্বকালীন রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। এই বন্যাকে greatest disaster of the century বললেও অত্যুক্তি হয় না। ২৭ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর-এর মৌসুমি নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে দামোদরের আবহক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হয়েছিল প্রায় ৫০০ মিলিমিটারের উপরে। এর ফলে মাইথন ও পাঞ্চেত যুক্ত অন্ত:প্রবাহ হয়েছিল ২১,৯১৯ কিউমেক। সেই ২১,৯১৯ কিউমেকের প্রবাহ পরিমিত হওয়াতে দুর্গাপুর ও রন্ডিয়াতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ এসেছিল যথাক্রমে ৯৩৪৫ এবং ১০,৯১৯ কিউমেক। ১৯৯৫ সালেও রন্ডিয়ার সর্বোচ্চ প্রবাহ ছিল ৬৫২২ কিউমেক। বিগত ২০০০ সালেও মৌসুমি নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে প্রবল বৃষ্টি হয় দামোদর অববাহিকায়। দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়ে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ ছিল ৬৩২৪ কিউমেক। এই সময় মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে জলপ্রবাহ হয়েছিল

২৮৪৮ কিউমেক ও আমতা খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল মাত্র ১০১২ কিউমেক জলরাশি।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় এই নদে ১৭৩০ থেকে ১৮১৬ সাল অবধি স্বাভাবিক বন্যার ব্যবধান ছিল ১৩ বছর। পরবর্তী কালে বন্যা আসে ৭ এবং ১১ বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮২৩ ও ১৮৩৪ সালে। তারপরের বন্যাটি আসে ছয় বছর পর ১৮৪০ সালে। তারপরে ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকে। দামোদরে বন্যা হয় ১৮৪১, ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালগুলিতে অর্থাৎ ১১৫ বছরের মধ্যে ১৩টি বন্যা হয় প্রথম ৮৫ বছরে ও ৬টি হয় পরের ৩০ বছরে। সুতরাং, দামোদর নদের বন্যা-প্রবণতা ক্রমশই বাড়তে থাকে (সেজ প্রমুখ, ১৮৪৬)। ফলত এর কারণগুলি অনুসন্ধান-এর গুরুত্ব বাড়তেই থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত মৎস্যপুরাণে দামোদরকে মহাগৌরী বলা হয়েছে। দামোদরকে দুর্গম নদও বলা হয়েছে সেখানে (আলি, ১৯৬৬)। ভারতের অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থে এই নদের বন্যার ভয়াবহতার কোনও উল্লেখই নেই। ইজিপ্ট-এর জলসেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার স্যার উইলিয়াম উইলককস্ ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর একটি বক্তব্যে নিম্ন দামোদরের মাটিকে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট অঞ্চলের মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। উনি এ কথাও বলেছেন যে ১৬৬০ সালে ভূপর্যটকগণ মধ্যবঙ্গকে বলেছেন মিশরের মতোই উন্নত। ১৮১৫ সালে হ্যামিল্টন সাহেব বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি অঞ্চলকে অবিভক্ত ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট কৃষি অঞ্চল বলে বর্ণনা করেন (উইলককস্, ১৯৩০)। কিন্তু ১৮১৫ সালের পর দামোদর ও তার পরিত্যক্ত খাতগুলির যথাযথ ব্যবহার বা সংস্কার সাধন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অবহেলা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মারাঠা আফগান যুদ্ধের সময় থেকেই। তখনই এই রাজ্যের শাসনভার নেয় ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়। তৎকালীন ইংরেজ বণিক শ্রেণীর পক্ষে দামোদরের শাখা নদী বা খালের গুরুত্ব বোঝা সম্ভব ছিল না। তাঁরা ভাবতেন এইগুলি নৌ-পরিবহণের জন্য রয়েছেন। ইংরেজদের তৈরি আইনে দামোদরের বাঁধগুলি জমিদারদের অধীনে চলে গেল যা ছিল সাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৮৩৬ সাল থেকে বাঁধ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। এই সময় কঠিন বাঁধ ভেঙে গিয়ে গ্রাম বসতি, কৃষিজমি, মানুষ, পশু ভাসিয়ে দিতে শুরু করল। ১৮৪০ সালে বর্ধমান শহর সেই প্রথম এক বছরে তিনবার বন্যা প্লাবিত হয়। নদীর ডানদিকের বাঁধ ১১৩ জায়গায় ফাটল সৃষ্টি করে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনাগুলি মানুষের কাছে দামোদরের প্রবল বন্যার ধ্বংসলীলা বলে পরিচিত। যদিও স্যার উইলিয়াম উইলককস্ বলেছেন যে এগুলি সবই কৃত্রিমভাবে তৈরি ফাটল। চাষিরা বাঁধে ফাটল করে পলি সমৃদ্ধ জল নিয়ে যেত তাদের জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে (উইলককস্, ১৯৩০)। এই বাঁধ কেটে জল নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আজও নিম্ন দামোদরে দেখা যায়। ১৮৪৬ সালে তৎকালীন সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বঙ্গের সমস্ত নদনদীকে বাঁধ মুক্ত করার কথা বলা হয়। প্রশ্ন ওঠে, নদীতে বাঁধ দেওয়ার জন্য নদীতে পলি জমে নদী বক্ষ অগভীর হচ্ছে, জলপরিবহণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং লাগোয়া কৃষি জমি পলি সমৃদ্ধ জল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে অনুর্বর হচ্ছে। তৎকালীন জমিদারেরা বাঁধকে নদীর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দুরে করার কথা ভেবেছিলেন যেহেতু বাঁধ ও নদীর মধ্যবর্তী জমি পলি সমৃদ্ধ ও উর্বর বলে বিবেচিত হত (রিকেটস্, ১৮৫৩; ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। অপরপক্ষে, বাঁধের পিছনের জমি পলি সমৃদ্ধ ও উর্বর না হলেও জমিদারদের বেশি খাজনা দিতে হত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠল যে বাঁধগুলি ভেঙে ফেলা হোক। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার একে একে রাজপথ ও রেলপথ তৈরি শুরু করেন। হাওড়া ও হুগলি জেলায় শিল্প বাণিজ্য প্রসারে নদীর ধারে কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে।

দামোদরের ডান দিকের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। দামোদরের বাম দিকে অবস্থিত বর্ধমান শহর, রেলপথ, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও শিল্প নগরীকে দামোদরের বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডান দিকের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এই সময়ে বন্যার দিনগুলিতে দামোদরে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ আসত ১৮,২৭৫ কিউবিক মিটার। সেই জলপ্রবাহ বহন করার জন্য ৩.২ কিলোমিটার চওড়া ও

ছয় মিটার গভীর নদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দামোদর কোথাও ৩.২ কিলোমিটার চওড়া ছিল না। বর্ধমানের ২৫.৬ কিলোমিটার পশ্চিম থেকে আমতা পর্যন্ত জল পরিবহণ ক্ষমতা ক্রমশ কমে গিয়েছিল। সেই সময়ে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে বিপুল জলরাশি প্রবল বন্যায় দামোদরে আসত তার ৮ ভাগের ১ ভাগ দামোদর নিয়ে যেতে পারত তার আমতা খাত দিয়ে। এই সব নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে ডান দিকের বাঁধ ভেঙে দিলে বর্ধমানের ৮ কিলোমিটার পশ্চিম থেকে নিচের দিকে বন্যার জলের স্তর ২.৪৪ মিটার থেকে কমে হবে ১.২২ মিটার। ফলত ডানদিকের বাঁধগুলি রক্ষা পাবে। অবশেষে বর্ধমান শহর, রেলপথ, রাজপথ, শিল্পনগরী রক্ষা করার জন্য ডানদিকের প্রায় ৩২ কিমি পাড় বাঁধ ভেঙে দেওয়া হয় ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে। সেই সঙ্গে বামদিকের বাঁধ আরও উঁচু ও সুদৃঢ় করা হয়।

১৮৮১ সালে বর্ধমানের নিকট ঝুঝুটিতে একটি জলদ্বার (sluice gate) নির্মাণ করা হয় দামোদরের জল বাঁকাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দামোদরের উদ্বৃত্ত জল ঝুঝুটি জলদ্বার দিয়ে বাঁকা নালায় প্রবেশ করে ১১ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বর্ধমানের কাছে কাঞ্চননগরে একটি ছোট বাঁধের (anicut) মাধ্যমে ইডেন খালে যেত। দামোদরের ডানদিকের পাড়ের সমান্তরালে অবস্থিত ইডেন খাল দিয়ে সেই জল প্রায় ৩২ কিলোমিটার নিচে গিয়ে জামালপুরের কাছে কানা নদীতে এসে পড়ত। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল যে বাঁধ নির্মাণের ফলে দামোদরের সঙ্গে বিছিন্ন হয়ে যাওয়া খাতগুলি পুনরুজ্জীবিত করা। জামালপুরের নিয়ন্ত্রকটি নির্মিত হয় ১৮৭৪ সালে। কানা নদী ও সরস্বতী গোপালনগরের কাছে একটি ছোট খালের দ্বারা যুক্ত ছিল সেই সময়ে (বসু ও ভট্টাচার্য্য, ১৯৯২; ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)।

১৯৩৩ সালে পানাগড়ের কাছে রন্ডিয়াতে একটি উইয়্যার ও খাল করা হয় জলসম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উদ্দেশ্যে। পরবর্তী কালে ১৯৪৩ সালে দামোদরে আবার প্রবল বন্যা হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই বন্যার পরেই দামোদরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবেন। ১৯৪৩-এর সর্বোচ্চ প্রবাহ ছিল মাত্র ৯৯১২ কিউমেক। কিন্তু তার ফলে বর্ধমানের আমিরপুরের কাছে বামদিকের পাড়ে ফাটল সৃষ্টি করে দামোদর তার পূর্বের পরিত্যক্ত খাত দিয়ে কালনার নিকট ভাগীরথীর দিকে ছুটে যায়। সেই সময় প্রায় ১.৮৩ থেকে ২.১৩ মিটার উঁচু জলস্তর সমস্ত জলপথ, রেলপথ ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তখন দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৪-এর ১০ মার্চ সেই কমিটি তাদের প্রস্তাব পেশ করেন এবং বর্ধমানের রাজা বাহাদুর উদয়চাঁদ মহতাব-এর নেতৃত্বে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন করার কথা ভাবা হয়। অবশেষে আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ.এল.ভুরডুইন সাহেব-এর পরিকল্পনা মাফিক ১৯৪৮ সালের ৭ জুলাই ভারতের ব্যবস্থাপক সভা দামোদর উপত্যকা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ডিভিসি আইন প্রণয়ন করেন এবং টেনিসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণেই গড়ে তোলা হয় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি, সারণি - ১)।

সারণি - ১

ডিভিসি বিন্যাস (network)

সেবিত এলাকা	-	২৪,২৩৫ বর্গ কিলো মিটার
মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	-	২৭৬১.৫০ মেগা ওয়াট
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	-	৫টি (পূর্ণক্ষমতা : ২৫৩৫ মেগা ওয়াট)
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	-	৩টি (পূর্ণক্ষমতা : ১৪৪ মেগা ওয়াট)
গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র	-	১টি (পূর্ণক্ষমতা : ৮২.৫ মেগা ওয়াট)
প্রধান বাঁধ	-	তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেত, তেনুঘাট, দুর্গাপুর
সেচ সেবিত এলাকা	-	৫.৬৯ লক্ষ হেক্টর
সম্ভাব্য সেচ সেবিত এলাকার আয়তন	-	৩.৬৪ লক্ষ হেক্টর

পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	-	১২৯২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	-	২৪৯৪ কিলোমিটার
মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এলাকা	-	৪ লক্ষ হেক্টর (আনুমানিক)
চেক বাঁধের সংখ্যা	-	১০,০০০ (আনুমানিক)

সূত্র : ডিভিসি, কলকাতা

প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা

- মূল দামোদরের ওপর সালামপুর (পাঞ্চেত), বার্মো ও আইয়ারে-এ তিনটি বাঁধ নির্মাণ।
- বরাকর নদীর ওপর তিলাইয়া, বলপাহাড়ি ও মাইথনে তিনটি বাঁধ নির্মাণ।
- কোনার নদীর ওপর কোনার বাঁধ।
- দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ।

ডি ভি সি বহুমুখী প্রকল্প:

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ সেচ ও জল সরবরাহ।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও বিতরণ।
- দামোদর এবং তার উপনদী ও শাখানদী সমূহের নাব্যতা রক্ষা।
- দামোদর উপত্যকার ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ ও বনসৃজন।
- দামোদর উপত্যকার জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ।

নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা

ডি ভি সি হওয়ার পরেও নিম্ন দামোদরে বন্যা এসেছে বার বার। নিম্ন দামোদরের প্লাবনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬০ সালে গঠন করেন একটি বন্যা তদন্ত কমিটি। এই কমিটি মান সিং-এর নেতৃত্বে ১৯৬০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার রায়না থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন মুইদিপুরে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে মূল দামোদরের জলকে মজা দামোদর ও কাঁকি মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে প্রবাহিত করার কথা।

১৯৭০-৭১ সালে নিম্ন দামোদরের বন্যা, জলনিকাশী প্রণালীর উন্নতি সাধন, কৃষি ও সেচের সুবিধার জন্য নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার প্রকল্পগুলি ছিল নিম্নরূপ (ডিভিসি, ১৯৭৮; ঘোষ, ১৯৯৩)।

প্রথম পর্ব:

- মজা দামোদরের নিচে আমতা খাত ও মাদারিয়া খালের সংযোগ স্থল থেকে নতুন করে খনন।
- আমতা খাতের মোহনায় ৫৬৬ কিউমেক (২০,০০০ কিউসেক) জল নিষ্কাশন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জলদ্বার তৈরি করা।
- মাদারিয়া খাল, ডাকাতিয়া খাল ও গাইঘাটা প্রভৃতি খালের সংস্কার।

দ্বিতীয় পর্ব:

- মুণ্ডেশ্বরী নদীর উভয় তীরে রূপনারায়ণ পর্যন্ত ১৩১ কিলোমিটার নদীর বহন ক্ষমতাকে ৭০৮০ কিউমেক (২৫০,০০০ কিউসেক) করা।
- মজা দামোদর ও রামপুর খালের সংস্কার।
- বিচ্ছিন্ন নিম্ন জলাভূমিগুলির জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করা।

তৃতীয় পর্ব:

চাষের সুবিধার জন্য আমতা খাতের মুখে একটি নিয়ন্ত্রক সহ তির্যক বাঁধ নির্মাণ।

মুণ্ডেশ্বরীর দুইপাশের বাঁধের মধ্যবর্তী মানুষের অভিযোগে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি।

পরবর্তী কালে আমতা খাতকে নিকাশী খাল হিসাবে সংস্কার করার কথাও ভাবা হয়। আমতা খাত সংস্কার করে তার জলপরিবহণ ক্ষমতাকে ৭০৮ থেকে ৮৪৯ কিউমেক করে বেগুয়াহানা থেকে থলিয়া হয়ে বকসি পর্যন্ত খালপথে দামোদরের জল রূপনারায়ণে নিয়ে যাওয়ার কথাও চিন্তা করা হয়। এই প্রকল্পও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সফল হয়নি।

সম্প্রতি আমতা খাতের নিম্নাংশে ও শ্যামপুর থানার উলুঘাটার গড়চুমুকে ৫৬৬ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন জলদ্বার তৈরি করা হয় বন্যার সময় দামোদরের উদ্বৃত্ত জল যাতে হুগলিতে প্রবেশ করে এবং জোয়ারের সময় হুগলি থেকে জল যাতে দামোদরে প্রবেশ করে জলসেচের কিছু সুবিধা করতে পারে। হুগলি ও দামোদরের মাঝে একটি খাল কেটে এই উদ্বৃত্ত জল জলসেচের জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

দামোদর নদের নিয়ন্ত্রণ যেন একটা প্রবহমান প্রক্রিয়া। ঝুঝুটি জলদ্বারকে বালির বস্তা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন। দামোদরের স্রোতকে প্রতিহত করে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী সেতু তৈরি করে বালি তোলা এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীগর্ভে পরিখা (dyke) করে নদীর স্রোতকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যত্রতত্র। দামোদরের ওপর মানুষের এই ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে দামোদরের স্বাভাবিক গতি একেবারে রুদ্ধ। দামোদরকে স্বাভাবিক খাত না বলে "জলাধার খাত" (reservoir channel) বলাই বোধহয় এখন যুক্তিযুক্ত (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০০)।

দামোদর নদে নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া : একাল ও সেকাল

দামোদরে বাঁধ-এর অস্তিত্ব আছে সেই ১৭৫২ সাল থেকে (রিকেটস্, ১৮৫৩)। যদিও কপিল ভট্টাচার্য্য (১৯৫৯)-এর মতে দামোদরের বাঁধ প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো। বাঁধগুলি উঁচু ছিল না, এক সমতলেও ছিল না। যদি এক অংশ .৯১মিটার উঁচু থাকে বন্যার জলস্তর থেকে, তার পাশের অঞ্চলটি অনেক নিচু হওয়ায় প্রায় বন্যায় ভেঙে যেত। বহু গ্রামও ভাসিয়ে দিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব জায়গায় সমান ভাবে সমান উচ্চতায় বাঁধ দেওয়ার কথা ভাবাই হয়নি। নিম্ন দামোদরে বাঁধ ভেঙে পড়ে ১৭৭০, ১৭৮৭,১৭৮৯, ১৮২৩, ১৮৩৫, ১৮৪০, ১৮৪৫ সালে। প্রায় ২৫টি জায়গায় ফাটল ধরে ১৮৪৭ সালে, ১৪টি জায়গায় ১৮৪৯ সালে, ৫৬ টি জায়গায় ১৮৫০ সালে, ৪৫ টি জায়গায় ১৮৫২ সালে, ২৮টি জায়গায় ১৪৫৪ সালে (ওমালি, ১৯১২ ; ভট্টাচার্য্য,১৯৯৫)। এই ঘটনাগুলি দামোদরের প্রবল বন্যার ধ্বংসলীলা বলে পরিচিত হলেও জানা যায় যে এই বাঁধ কাটার কাজটা যৌথভাবেই করতেন স্থানীয় কৃষকেরা তাদের জমিতে পলিসমৃদ্ধ জল নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে সরকারি কর্তৃত্ব ছিল না। দামোদরের বন্যার পলিসমৃদ্ধ জলকে এই ভাবেই স্থানীয় লোকেরা সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করত। উইলিয়ম উইলককস্ সাহেব বলেছিলেন, হাওড়া ও হুগলির সমস্ত কানা ও মজা নদীগুলি দামোদরের নিয়ন্ত্রিত বন্যায় সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কাটা খাল ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে পৌরাণিক যুগের রাজারা ব্যাবিলন অর্থাৎ বর্তমানে ইরাক থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে এই খাল বা ক্যানালগুলি কাটিয়েছিলেন। ক্যানাল শব্দটিই বহুদিন ধরে ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে বাঙালির নিজস্ব শব্দ কানাতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে দামোদরের শাখানদী বলে চিহ্নিত সবই কৃত্রিম উপায়ে কেটে আনা খাল (উইলককস্, ১৯৩০; ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, ২০০০)। যদিও ভৌগোলিকদের মতে এসব খাল দামোদরেরই পরিত্যক্ত খাত। অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়ের ফলে এই খাতগুলি আর জল ধরে রাখতে পারত না। বছরের পর বছর ধরে খাতগুলি ভরাট হয়ে গিয়েছিল। দামোদর নদ তার পথ পরিবর্তন করায় এই নদীগুলি মজে এখন মৃতপ্রায়। এ কথা জানা আছে যে রামায়ণের ভগীরথ দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য গঙ্গা থেকে কাটা পথে ভাগীরথীকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই ভগীরথের আমল থেকেই দামোদরের তীরবর্তী মানুষ নদের পলি সমৃদ্ধ জলকে তাদের চাষ আবাদের কাজে লাগিয়ে এসেছে। দেশিয় প্রথা অনুসরণ করে পুকুর ও জোহর কেটে জল ও পলি আটকে রাখত তারা। বন্যা ছিল তখন আশীর্বাদস্বরূপ (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, ২০০০)।

দামোদরের ডানদিকের বাঁধ ভেঙে ফেলার ও বাম দিকের বাঁধ সুদৃঢ় করার প্রতিক্রিয়া

• দামোদরের ডানদিকের বাঁধ ভেঙে দেবার ফলে ৭৬২টি গ্রাম সহ প্রায় ৬১৯ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল বন্যার কবলে পড়ে। দক্ষিণবঙ্গের আরামবাগ, খানাকুল তখন থেকেই অর্থাৎ ডিভিসি হওয়ার বহু পূর্বেই বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে।

• প্রতিবারের বন্যায় দক্ষিণবঙ্গের ধান জমির এক বিশাল অংশ নষ্ট হত যার আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। পরবর্তী কালে ডান পাড় উপচে পড়া পলি সমৃদ্ধ জলে বিশাল অঞ্চল উর্বর হওয়াতে প্রচুর রবি শস্যের ফলন এই ক্ষতি পূরণ করে।

• বর্ষাকালে প্রবল বন্যার সময় মাঝে মাঝেই দামোদর নিজের খাত পরিবর্তন করে নতুন পথে ছুটে যেত স্থানীয় ভাবে যাকে বলা হত 'হানা'। দামোদর নদে সেই সময়ে ১১টি হানার সৃষ্টি হয়।

• দক্ষিণদিকের পাড় উপচে জল প্রবাহিত হওয়ার ফলে ১৯৫৯ ও ১৯৭৮-এর প্রবল বন্যায় দামোদরের বামপাড়ের বাঁধে ফাটল ধরেনি। জানা যায়, ১৯৫৬ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর রন্ডিয়ায় সর্বোচ্চ জল প্রবাহ ছিল ৮৬৯৪ কিউমেক, ২৭ সেপ্টেম্বর জামালপুরে জলপ্রবাহ ছিল ৩০০২ কিউমেক, মুচি হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীতে প্রায় ৭৩০৭ কিউমেক জল প্রবাহিত হয়েছিল। সেদিন চাঁপাডাঙা দিয়ে আমতা খাতে প্রবাহিত হয়েছিল ৭০৮ কিউমেক জলপ্রবাহ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৫৬৯২ কিউমেক জলপ্রবাহ ডানপাড়ে উপচে পড়ে সিলনা ও জামালপুরের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল (ডিভিসি, ১৯৭৮)।

• নদীবাহিত পলি পড়ে দামোদরের গর্ভ অনেক উঁচু হয়েছে পরবর্তী কালে এবং ডানদিকের স্বাভাবিক বাঁধও উঁচু হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে নদীর জলপ্রবাহ বামপাড়ের বাঁধে প্রতিহত হওয়ায় ১৯৯৫-এর বন্যায় দামোদরের বাম পাড়ের বাঁধে বেশ কয়েকটি ফাটল হয়েছিল। বর্ধমানের কাছে বেশ কয়েকটি জায়গায় নদীর পাড় সরে গেছে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০)।

দামোদরের ডান দিকের বাঁধ ভেঙে দেওয়া হয় কিন্তু বামপাড়ের বাঁধ আরও উঁচু ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়। স্যার উইলিয়ম উইলককস্ এই বাঁধকে 'শয়তানি বাঁধ' আখ্যা দিয়েছেন (সাহা, ১৯৪৪)। ডঃ বেন্টলি, স্যার উইলিয়ম অ্যাডামস্ ও স্যার উইলিয়ম উইলককস্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ হিসাবে এই শয়তানি বাঁধকেই দায়ী করেছেন। তাঁদের মতানুযায়ী আষাঢ়ের বন্যায় দামোদর অসংখ্য মাছের ডিম ও চারা মাছ ধানের খেতে ছেড়ে দিত। তারা বাড়ত মশার লার্ভা খেয়ে। ফলস্বরূপ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না। কিন্তু এই শয়তানি বাঁধ জলকে প্রতিহত করার ফলে এবং মূল নদের সঙ্গে শাখানদীগুলিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার জন্য কৃষিজমির উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, মাছের জোগানও কমে গেছে এবং এই গোটা অঞ্চল ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে ১৮৫০ থেকে ১৯২৫ অবধি। এই সমস্যাগুলি এখনও থেকে গেছে (বিশ্বাস ও বর্ধন, ১৯৭৫; ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)।

ডিভিসি জলাধার-এর প্রতিক্রিয়া

দামোদর নদে মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ নির্মাণের প্রাক্কালে রন্ডিয়াতে এক দশকের (১৯৪০-৪৯) দৈনিক জলপ্রবাহের হিসাব থেকে দেখা যায় যে শতকরা ৬২.৬ দিনের জলপ্রবাহ ছিল ২৮৩.২ কিউমেক (১০,০০০, কিউসেক)-এর কম। শতকরা ৩.৪৪ দিনের জলপ্রবাহ ছিল ২২৬৬ কিউমেক (৮০,০০০ কিউসেক)-এর বেশি। বাঁধ হওয়ার পরবর্তী কালে জলপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটেছে। বাঁধ হওয়ার পরবর্তী কালে কয়েক বছরের (১৯৯৩-৯৫) হিসাবে দেখা গেছে যে শতকরা ৬৬.৪০ দিনের জলপ্রবাহ ছিল ২৮৩.২ কিউমেক-এর কম এবং শতকরা ১দিন জলপ্রবাহ এসেছিল ২২৬৬ কিউমেক-এর বেশি। বাঁধ নির্মাণের আগে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিবছর গড়ে ২২৯ দিন এর দৈনিক গড় জলপ্রবাহ ছিল ২৮৩ কিউমেক-এর কম। বাঁধ নির্মাণের পরে অর্থাৎ কৃত্রিম অবস্থায় তা বেড়ে হয়েছে ২৪২ দিন। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি বছর গড়ে ১২ দিন জলপ্রবাহ থাকত ২২৬৬ কিউমেকের উপরে কিন্তু কৃত্রিম অবস্থার অর্থাৎ জলাধার

তৈরির পরে বছরে গড়ে ৪ দিন জলপ্রবাহ থাকে ২২৬৬ কিউমেকের ওপরে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, ২০০১)।

দামোদর নদে মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ নির্মাণের আগে (১৯৩৪-১৯৫৬) ও পরবর্তী কালে (১৯৬০-১৯৯৫) প্রতি মাসের গড় জলপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে বাঁধ নির্মাণের পরে জলপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে (সারণি - ২)। বাঁধ নির্মাণের প্রাক্কালে (১৯৩৪-১৯৫৬) গ্রীষ্মকালের (মার্চ-মে) গড় জলপ্রবাহ শতকরা ১.৪ থেকে বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে (১৯৬০-১৯৯৫) বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ৫.৪। যদিও সমক বিচ্যুতি (standard deviation) এবং ভেদাঙ্ক (co-efficient variability) বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭.৭৯ এবং ১৪৪.৩। অনুরূপ ভাবে বর্ষাকালের গড় জলপ্রবাহ শতকরা ৮৩.৭০ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ৭৬.৩৩। বাঁধ হওয়ার আগের কালে শতকরা বার্ষিক জলপ্রবাহ ৪০৬১ কিউমেক থেকে বাঁধ হওয়ার পরবর্তী কালে কমে গেছে ২৬৭৬ কিউমেক-এ। সেই আগের কালে এপ্রিল ও অগাস্ট মাসে রন্ডিয়াতে গড় জলপ্রবাহ ১১.২২ কিউমেক ও ১২৬৭.৪৩ কিউমেক থেকে পরবর্তী কালে হয়েছে যথাক্রমে ২০.৬০ কিউমেক ও ৬৬৩.৩২ কিউমেক। বাঁধ হওয়ার পরবর্তী কালে গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও বর্ষাকালে জলপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছে (ভট্টাচার্য্য,১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০০)।

সারণি - ২

রন্ডিয়াতে দামোদরের জল প্রবাহের (discharge) বৈশিষ্ট্যাবলি

(গড় বার্ষিক সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে শতাংশ হিসাবে প্রবাহের মাত্রা)

সময়	পরিমাত্রা	গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শরৎকাল	শীতকাল	গড় বার্ষিক সমগ্র (কিউমেক)
প্রাক্-বাঁধ	বছরের সংখ্যা	২১	২১	২১	২১	২১
(১৯৩৪-৫৬)	গড় জলপ্রবাহ %	১.৪	৮৩.৭০	১২.২	২.৭	৪০৬১
	সমক বিচ্যুতি	১.৩	৬.৯	৬.৩	১.৫	১১৫৮
	ভেদাঙ্ক	৯২.৮৬	৮.২	৫১.৬৪	৫৫.৫৫	২৮.৫২
বাঁধ পরবর্তী	বছরের সংখ্যা	২৮.	২৮	২৮	২৮	২৮
(১৯৬০-৯৫)	গড় জলপ্রবাহ %	৫.৪০	৭৬.৩৬	১৩.৯৭	৩.৯১	২৬৭৬
	সমক বিচ্যুতি	৭.৭৯	১৩.৮১	১২.০২	২.৭১	১৫৭৬
	ভেদাঙ্ক	১৪৪.৩	১৮.০৯	৮৬.০৪	৬৯.৩	৫৮.৮৯

উৎস : ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০

বাঁধ নির্মাণের আগে (১৯৩৪-১৯৫৬) দামোদরের রন্ডিয়ায় সর্বোচ্চ জল প্রবাহের (peak flow) গড় ছিল ৯৬০৬ কিউমেক। পরবর্তী কালে (১৯৫৯-২০০০) তা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে ৩৫৬৯ কিউমেক-এ।

বাঁধ নির্মাণের আগে প্রতি বছরের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ পরিগণিত সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের (computed peak flow) উভয়দিকে ৩৬১৩.৫৬ কিউমেকের মধ্যে থাকত। কিন্তু ১৯৩৫ (১৮,১১২ কিউমেক) ও ১৯৪১(১৭,৯৪২কিউমেক)-এর সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ দামোদরের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের স্বাভাবিক রীতিকে ছাপিয়ে চলে গেছে বহুদূরে। অপরদিকে, বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে প্রতি বছরের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ পরিগণিত সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের উভয়দিকে ২১২৮.০১ কিউমেক-এর মধ্যে থাকে। এই সময়ে অস্বাভাবিক বন্যা এসেছে ১৯৫৯ (৮৭৯২ কিউমেক), ১৯৭৮ (১০৯১৯ কিউমেক), ১৯৯৫ (৬৫২২ কিউমেক) ও ২০০০ (৬৩৮৭ কিউমেক) সালগুলিতে। রন্ডিয়াতে পরিমাপ করা এই সর্বোচ্চ জলপ্রবাহগুলি বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে দামোদর নদের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের স্বাভাবিক রীতিকে ছাপিয়ে গেছে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, ২০০১)।

দামোদরের বন্যার বারংবার আগমনের বিশ্লেষণ (flood frequency analysis) থেকে দেখা যায় যে বাঁধ নির্মাণের আগে গড় বাৎসরিক বন্যা (mean annual flood < q2.33>) এবং সম্ভাব্য বাৎসরিক বন্যার (probable annual flood < q1.58>) মাত্রা (order) ছিল যথাক্রমে ৮০৮৭.৯৯ ও ৬৪২৪.৫৪ কিউমেক। বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে এই ধরনের বন্যার মাত্রা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৫৪৬.৪৪ ও ২৪৭১.৭৩ কিউমেক-এ। বাঁধ নির্মাণের আগের কালে দামোদরে ৭০৮০কিউমেক অর্থাৎ ২৫০,০০০ কিউসেক (bankful stage) এর বন্যা আসত প্রায় প্রতি বছরই। এই জলপ্রবাহের (৭০৮০ কিউমেক) পৌনঃপুনিক ব্যবধান (recurrence interval) ছিল ১.৮ বছর। বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে ওই ৭০৮০ কিউমেক-এর বন্যার পৌনঃপুনিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৮ বছর থেকে ১৪ বছর-এ। অনুরূপ ভাবে ১০,০০০ কিউমেকের বন্যার পৌনঃপুনিক ব্যবধান বাঁধ নির্মাণের আগে ৩.৭৮ থেকে পরবর্তীকালে বেড়ে হয়েছে ৭৭.২০ বছর-এ। বাঁধ হওয়ার আগের কালে ১০,০০০ কিউমেকের বন্যা আসত প্রতি ৩/৪ বছর অন্তর অন্তর, যা পরবর্তী কালে কদাচিৎই দেখা যাবে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০) এই বন্যাগুলি ছোটখাট প্লাবন সৃষ্টি করে দামোদরের গর্ভে জমা পলিকে দুই তীরভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে নদীখাতের জলবহন ক্ষমতাকে ঠিকভাবে বজায় রাখত এবং নদীর দুই তীরের ভূমির উর্বরাশক্তিকে বাড়াত। বিশেষজ্ঞদের মতে দামোদরের এই বন্যা শুধু অবশ্যম্ভাবীই ছিল না, অপরিহার্যও ছিল। দামোদরের বন্যার জল ভাগীরথী, হুগলি নদীর পলি সরাত। আজ প্রবল বন্যার প্রকোপ কমে যাওয়াতে কলকাতা বন্দরের অবনতি ঘটেছে। আজ এই বন্যাকে জলাধারে বন্দি করার ফলে দামোদরের জল পরিবহণের ক্ষমতা কমে গেছে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯)।

বাঁধ নির্মাণের আগে (১৯৩৩-৫৬) রড্ডিয়াতে ১০,০০০ কিউসেকের বেশি জলপ্রবাহ এসেছিল পাঁচবার এবং ১০,০০০ কিউমেকের কাছাকাছি জলপ্রবাহ এসেছিল তিন-চার বার। বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে (১৯৫৮-২০০০) মাইথন-পাঞ্চেত-এ ১০,০০০ কিউমেকের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের অন্তঃপ্রবাহ (peak inflow) হয়েছে বারো বার (ভট্টাচার্য, ১৯৯৯-২০০০)। ডিভিসি-র মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধের জন্য সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের বহিঃপ্রবাহ (out flow) পরিমিত (moderated) হয়েছে অর্থাৎ জলপ্রবাহের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে (সারণি-৩)। ডিভিসি বাঁধের জন্য পরিকল্পিত বন্যার (design flood) তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৫৭ ভাগ (ভট্টাচার্য, ১৯৯৯-২০০০)।

সারণি - ৩

১৯৫৮ - ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রধান বন্যার সময়গুলিতে ডিভিসি-র ভূমিকা

তারিখ	বহিঃপ্রবাহ	অন্তঃপ্রবাহ	বন্যার পরিমিত (moderate) জলপ্রবাহ
	কিউমেক ('০০০) / কিউসেক ('০০০)	কিউমেক ('০০০) / কিউসেক ('০০০)	কিউমেক ('০০০) / কিউসেক ('০০০)
১৬-১৭ সেপ্টেম্বর'৫৮	১৫.৭ / ৫৫৫	৫.০ / ১৭৫	১০.৮ / ৩৪০
১-২ অক্টোবর'৫৯	১৭.৬ / ৬২৩	৮.২ / ২৪৪	৯.৫ / ৩৩৫
২৭-৯ সেপ্টেম্বর'৬০	৯.৯ / ৩৪৮	২.৬ / ৯২	৭.২ / ২৫৬
২-৩ অক্টোবর'৬১	১৪.৬ / ৫১৬	৪.৬ / ১৬১	১০.১ / ৩৫৫
২-৩ অক্টোবর'৬৩	১২.৮ / ৪৫১	৩.৪ / ১২১	৯.৩ / ৩৩০
২৪-২৫ অক্টোবর'৬৩	১৩.২ / ৪৬৫	২.৬ / ৯১	১০.৬ / ৩৭৪
১৬-১৮ জুলাই' ৭১	১২.০ / ৪২৪	৫.১/ ১৮১	৬.৯/ ২৪৩
১২-১৩ অক্টোবর'৭৩	১৬.৬ / ৫৮৮	৫.০ / ১৭৫	১১.৭ / ৪১৩
২৬-২৭ সেপ্টেম্বর'৭৫	৯.৭ / ৩৪৪	৩.১ / ১১১	৬.৬/ ২৩৩

২৬-২৭ সেপ্টেম্বর'৭৮	২১.৯ / ৭৭৪	৪.৬ / ১৬৩	১৭.৩/ ৬১১
২৯ সেপ্টেম্বর'৯৫	১৭.৫ / ৬১৯	৭.১ / ২৫০	১০.৪ / ৩৬৯
২৪ সেপ্টেম্বর'৯৯	১০.৩ / ৩৬৩	৩.৪/ ১২০	৬.৯ / ২৪৩
২২ সেপ্টেম্বর'০০	১০.৮ / ৩৮৩	৫.৭ / ২০০	৫.৩ / ১৮৬

দামোদরে বন্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৮৫৭ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত দামোদরের রানিগঞ্জ-এ পাওয়া সর্বোচ্চ জল প্রবাহের হিসাব থেকে দেখা যায় এই সময় স্বাভাবিক বন্যা (normal flood) অর্থাৎ ৫৬৬৪-৮৪৯৬ কিউমেক (২০০,০০০ - ৩০০,০০০ কিউসেক)-এর জলপ্রবাহ হয়েছে তেত্রিশ বার (সেন, ১৯৬২)। দামোদরে বাঁধ হওয়ার ঠিক আগে (১৯৩৩ - ১৯৫৬) রন্ডিয়াতে পাওয়া সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হিসাব থেকে দেখা যায় স্বাভাবিক বন্যা হয়েছে এগারো বার কিন্তু বাঁধ হওয়ার পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৫৯ - ২০০১-এর মধ্যে স্বাভাবিক বন্যা এসেছে মাত্র তিন বার। বাঁধ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে (১৯৩৩-৫৬) সাবনর্মাল বন্যা অর্থাৎ ২৪৭২-৫৬৬৪ কিউমেক (৮৭,২৮৮-২০০,০০০ কিউসেক)-এর বন্যা এসেছিল মাত্র চার বার। বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে স্বাভাবিক বন্যা কমে গেছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে সাবনর্মাল বন্যা। বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে এই সাবনর্মাল বন্যা এসেছে বাইশ বার (ভট্টাচার্য, ১৯৯৯, ২০০১) (সারণি - ৪)।

সারণি - ৪

দামোদরের বন্যার ইতিহাস

৬১ বছরে (১৮৫৭ - ১৯১৭) রানিগঞ্জে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ অনুযায়ী

অতি প্রচণ্ড অস্বাভাবিক বন্যা (১২৭৪৪ কিউমেকের অধিক)	-	১বার
অস্বাভাবিক বন্যা (৮৪৯৬ কিউমেকের অধিক)	-	১২বার
স্বাভাবিক বন্যা (৫৬৬৪-৮৪৯৬ কিউমেকের-এর মধ্যবর্তী)	-	৩৩ বার
সাবনর্মাল বন্যা (৫৬৬৪ কিউমেকের কম)	-	১৫ বার

২৪ বছরে (১৯৩৩ - ১৯৫৬) রন্ডিয়ার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ অনুযায়ী

অতি প্রচণ্ড অস্বাভাবিক বন্যা (১২৭৪৪ কিউমেকের অধিক)	-	২ বার
অস্বাভাবিক বন্যা (৮৪৯৬ কিউমেকের অধিক)	-	৭ বার
স্বাভাবিক বন্যা (৫৬৬৪-৮৪৯৬ কিউমেকের-এর মধ্যবর্তী)	-	১১ বার
সাবনর্মাল বন্যা (৫৬৬৪ কিউমেকের কম)	-	৪ বার

৪৩ বছরে (১৯৫৯ - ২০০১) রন্ডিয়ার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ অনুযায়ী

অতি প্রচণ্ড অস্বাভাবিক বন্যা (১২৭৪৪ কিউমেকের অধিক)	-	-
অস্বাভাবিক বন্যা (৮৪৯৬ কিউমেকের অধিক)	-	২বার
স্বাভাবিক বন্যা (৫৬৬৪-৮৪৯৬ কিউমেকের মধ্যবর্তী)	-	৩ বার
সাবনর্মাল বন্যা (২৪৭২-৫৬৬৪ কিউমেকের মধ্যবর্তী)	-	২২ বার

বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিভিসি জলাধারগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর বন্যা এসেছে ১৯৫৯,১৯৭৮ ও ২০০০ সালগুলিতে। এ ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা ভাল, নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তীব্রতাকে পরিমিত করা যায় কিন্তু নির্মূল করা যায় না। কদাচিৎ দেখা পাওয়া প্রলয়ঙ্করী বন্যাকে বাঁধ দিয়ে রোধ করা যায় না।

আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি অথরিটির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভুরডুইন দামোদর উপত্যকায় ৫০.৪

সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতজনিত ২৮,৩২১ কিউমেকের প্রবাহকে রন্ডিয়াতে ৭০৮০ কিউমেকে নামিয়ে আনার জন্য আটটি জলাধার নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। যার মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ৩৫৯৫.৬ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (ভুরডুইন, ১৯৪৭)। কিন্তু পরবর্তী কালে তিলাইয়া, কোনার, পাঞ্চেত ও মাইথনে জলাধার নির্মাণ করা হয়। তার পরবর্তী কালে দুর্গাপুরে একটি ব্যারাজ এবং শুধু জলসেচের জন্য তেনুঘাটে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ডিভিসি এই জলাধারগুলির সাহায্যে ১৮,৪০৮ কিউমেক (৬৫০,০০০কিউসেক) -এর বন্যাকে ৭০৮০ কিউমেক (২৫০,০০০ কিউসেক)-এ কমিয়ে আনা যাবে বলে ভাবা হয়। চারটি জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা ছিল ১২৯২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। মাইথন-পাঞ্চেতের জমি অধিগ্রহণ শেষ হলে জলধারণ ক্ষমতা হবে ১৮৬৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটার, যা কিনা পরিকল্পিত বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যা প্রয়োজন তার অর্ধেকের কিছু বেশি (ডি.ভি.সি, ১৯৯৫, ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০)।

ডিভিসি-র চারটি জলাধারে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে জল এসে জমা হয় তাদের আবহক্ষেত্র হল ১৭,১৪৬ বর্গ কিলোমিটার। যদি কখনও এই অঞ্চলে তিন দিন গড়ে ৪০.৬৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং কিছু জল বাষ্পীভবনের ফলে শোষিত হলেও তিনদিনের মধ্যে প্রায় ২৪.৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির জল নদীপথে জলাধারগুলিতে আসবে বলে অনুমান করা হয়। ৭২ ঘন্টায় ওই প্রবাহিত জলের পরিমাণ হবে প্রায় ৪.৩ লক্ষ হেক্টর মিটার (৩৫ লক্ষ একর ফুট)। ঘন্টা প্রতি যদি গড়ে .০৬ হেক্টর মিটার (০.৫ লক্ষ একর ফুট) জল নেমে আসে তা হলে দামোদরের গড় প্রবাহমাত্রা হবে ১৬৯৯২ কিউমেক (৬০০,০০০ কিউ-সেক)। জলাধারগুলি থেকে তখন ৮৪৯৬ কিউমেক (৩০০,০০০ কিউসেক) হারে জল ছাড়া হলেও জলাধারগুলি ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাড়তি জলের জন্য দুর্গাপুর বাঁধের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমাত্রা হবে প্রায় ১১৩২৮ কিউমেক (৪০০,০০০ কিউসেক)। জলাধারগুলিতে ৮৪৯৬ কিউমেক হারে জল থাকায় ঘন্টা প্রতি জলাধারগুলির.০৩ হেকটর মিটার (০.২৫ লক্ষ একর ফুট) ভরে যাবে। জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে যে অঞ্চল বন্যা নিয়ন্ত্রণে খালি রাখা হয় তা মাত্র ৪২ ঘন্টায় ভরে যাবে এবং পরবর্তী ৩০ ঘন্টা বন্যা নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির কোন ক্ষমতা থাকবে না (বেরা, ১৯৮২)। বর্তমানে জলাধারগুলিতে অধিগ্রহণ করা জমির স্তর পর্যন্ত অব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য (dead storage), ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য (live storage) ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য (flood storage) পলি সঞ্চয়ের ফলে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

জলাধারে পললক্ষেপণের তথ্য

প্রতি বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা তিনভাগে ভাগ করা যায়—সবচেয়ে নিচে থাকে অব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য যার জল কখনও বেরবে না। এর ওপরে থাকে ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য, যার জল ব্যবহৃত হয় সেচ, শিল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থের প্রয়োজনে এবং সবচেয়ে ওপরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্যে বন্যার জল ধরে রেখে তারপর নিয়ন্ত্রিত ভাবে জল ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী বন্যার জন্য অপেক্ষায় থাকা।

পাঞ্চেত জলাধারে শতকরা ৫৫.৫ ভাগ অব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য, শতকরা ৩৬ ভাগ ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য ও শতকরা ২.৬ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে পূর্ণ হয়েছে। মাইথন জলাধারে শতকরা ৫৪ ভাগ অব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য, শতকরা ২২.৪ ভাগ ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য ও শতকরা ৪.৩ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য পলি সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে, (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯-২০০০)(সারণি- ৫, ৫ক, ৫খ)। পাঞ্চেত জলাধারে ষষ্ঠ জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী জানুযারি ১৯৯৬ পর্যন্ত পলি সঞ্চয়ের পরিমান হল ২২২.৯১ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। এই জলাধারে ১৯৭৪ পর্যন্ত পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১৪৫.২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার অর্থাৎ ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পলিসঞ্চিত হয়েছে ৭৭.৭১ মিলিয়ন ঘন মিটার। এই জলাধারে পলি সঞ্চয়ের গড় বছরে প্রতি বর্গ

কিলোমিটারে ৬৪৮ ঘন মিটার (ডিভিসি, ১৯৯৭)। মাইথন জলাধারে পলি সঞ্চয়ের হার বছরে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৩০৪ ঘন মিটার (ডিভিসি, ১৯৯৪)। জলাধারগুলিতে পলি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ-এর ক্ষমতা কমে গিয়েছে ক্রমাগত।

জলাধার থেকে জলনিকাশের পরিমাপ

১৯৫৯ সালের প্রবল বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ডিভিসি, ১৯৬১ সালে জলাধার থেকে জল ছাড়ার একটি নতুন তালিকা নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী কালে বিহার (ঝাড়খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় জল আয়োগ মিলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাঁধের আদর্শ জলের মাত্রা স্থির করেছেন। বর্তমানে বাঁধে জল ধরে রাখা ও ছাড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র অধিকারী হল কেন্দ্রীয় জল আয়োগ কর্তৃপক্ষ।

সারণি - ৫

মাইথন জলাধারে পললক্ষেপণের তথ্য (১৯৯৪ সালের জরিপের ভিত্তিতে)

	প্রাথমিক সামর্থ্য (১০০০হেক্টর মি:)	বর্তমান সামর্থ্য (১০০০হেক্টর মি:)	সামর্থ্য হ্রাস (১০০০হেক্টর মি:)	সামর্থ্য হ্রাস (%)
১১৯ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অব্যবহার যোগ্য ধারণ সামর্থ্য	২০.৬৬	৯.৪৯	১১.১৭	৫৪.০
১১৯-২৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য	৫৫.৮১	৪৭.১১	১৩.৬৪	২২.৪
১২৫-৩৬ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য	৩৮.২৩	৩৬.৫৮	১.৬৪	৪.৩
১৩৬ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সামগ্রিক (over all) ধারণ সামর্থ্য	১১৯.৬৪	৯৩.১৯	২৬.৪৪	২২.১

পাঞ্চেত জলাধারে পললক্ষেপণের তথ্য (১৯৯৫ সালের জরিপের ভিত্তিতে)

	প্রাথমিক সামর্থ্য (১০০০হেক্টর মি:)	বর্তমান সামর্থ্য (১০০০হেক্টর মি:)	সামর্থ্য হ্রাস (১০০০হেক্টর মি:)	সামর্থ্য হ্রাস (%)
১১৯ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অব্যবহার যোগ্য ধারণ সামর্থ্য	২৩.৬৩	১০.৫০	১৩.১৩	৫৫.৫
১১৯-২৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ধারণ সামর্থ্য	২৫.২৪	১৬.১২	৯.১২	৩৬
১২৫-৩৬ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য	১০৯.৩০	১০৬.৩৮	২.৯১	২.৬
১৩৬ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সামগ্রিক (over all) ধারণ সামর্থ্য	১৫৮.১৬	১৩২.৯৯	২৫.১৭	১৫.৯

উৎস : ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯ - ২০০০

সারণি - ৫ক

পাঞ্চেত জলাধারে পলি সঞ্চয়ের হার (cu. m / sq. km. / year)

১৯৬২	১৯৬৪	১৯৬৬	১৯৭৪	১৯৮৫	১৯৯৬
১৩৩০$	১২৪০$	১০৫০$	১০০০ $	৬৭০ #	৬৪৮ #

$ - পাঞ্চেত অববাহিকা তেনুঘাট -এর অববাহিকা সহ

- পাঞ্চেত অববাহিকা তেনুঘাট-এর অববাহিকা ব্যতীত

ডিভিসি, ১৯৯৭

সারণি - ৫খ

মাইথন জলাধারে পলি সঞ্চয়ের হার (cu. m / sq. km. / year)

বছরের ব্যবধান	বছরের সংখ্যা	পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ (cu.m/sq.km./year)	পলি সঞ্চয়ের হার
১৯৫৫-৬৩	৮	৬৩	১৫২৪
১৯৫৫-৬৫	১০	৭৪	১৪২৯
১৯৫৫-৭১	১৬	১০৯	১৩৩৩
১৯৫৫-৭৯	২৪	১৫৫	১২৩৮
১৯৫৫-৮৭	৩২	২১৫	১২৯০
১৯৫৫-৯৪	৩৯	২৬৪.২৪	১৩০৪

ডি ভিসি, ১৯৯৪

কোন্ মাসে কত জল ছাড়া হবে তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম করা আছে। প্রথম পর্যায়ে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে বর্ষার এই চার মাস বন্যার জল যে পরিমাণেই এসে পড়ুক না কেন মোট বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্যের ২০ শতাংশ ভরে যাওয়া পর্যন্ত ১৯৮২ কিউমেক (৭০০০০ কিউসেক) হারে জল ছাড়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য ভরে যাওয়ার পর ৩৩৯৮ কিউমেক (১২০,০০০ কিউসেক) হারে জল ছাড়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ৪৫৩১ কিউমেক (১,৬০,০০০ কিউসেক) হারে জল ছাড়া হয়। চতুর্থ পর্যায়ে ৭০ থেকে ১০০ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জল ছাড়ার হার বাড়িয়ে ৫৬৬৪ কিউমেক (২০০,০০০ কিউসেক) করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে সমস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ধারণ সামর্থ্য পরিপূর্ণ হয়ে গেলে বাঁধে যতটা জল এসে পড়বে সেই হারেই জল ছাড়া হবে অর্থাৎ বাঁধের জমা জলের মাত্রা যেন অপরিবর্তিত থাকে। অক্টোবরে বন্যার প্রবণতা থাকে না বলে সেই সময়ে জল ছাড়ার হার কিছুটা কমানো হয় (সারণি-৬)।

সারণি - ৬

মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল নিকাশের নিয়মাবলি (জুন - সেপ্টেম্বর)

জলাধার থেকে জলপ্রবাহের বহির্গমন কিউমেক (কিউসেক)	যৌথ জলাধারের আবশ্যিক জলসঞ্চয়
১,৯৮২ (৭০,০০০)	২০ % বা তার কম
৩,৩৯৮ (১,২০,০০০)	২০% - ৫০%
৪,৫৩১ (১,৬০,০০০)	৫০% - ৭০%
৫,৬৬৩ (২,০০,০০০)	৭০% - ১০০%

মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল নিকাশের নিয়মাবলি (অক্টোবর)

জলাধার থেকে জলপ্রবাহের বহির্গমন কিউমেক (কিউসেক)	যৌথ জলাধারের আবশ্যিক জলসঞ্চয়
১,৯৮২ (৭০,০০০)	২০ % বা তার কম
২,২৬৫ (৮০,০০০)	২০% - ৫০%
৩,৩৯৮ (১,২০,০০০)	৫০% - ৭০%
৪,৫৩১ (১,৬০,০০০)	৭০% - ১০০%

উৎস : রেগুলেশন ম্যানুয়াল, ২০০১

নিম্ন দামোদরের নিম্নাংশে বন্যা প্রবণতার কারণ

জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার নিয়মাবলি নিম্ন দামোদরের উচ্চাংশে সফল হলেও নিম্নাংশে পুরোপুরি অসফল প্রতিপন্ন হয়েছে। আমতা খাতের জল নির্গমন ক্ষমতা হল ৮৪৯ কিউমেক (৩০,০০০ কিউসেক) এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল নির্গমন ক্ষমতা হল ২৮৩২ কিউমেক (১০০,০০০ কিউসেক) (রিপোর্ট, ২০০১)।

২০০১-এর ২ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর ব্যারেজের সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ ছিল ১৭২৭.৫২ কিউমেক (৬১,০০০ কিউসেক)। ২০০১-এর ৩ সেপ্টেম্বর মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে জলপ্রবাহিত হয়েছে ১৩৫৬.৭৪ কিউমেক এর জল প্রবাহ। মুণ্ডেশ্বরী নদী দিয়ে ৭৮.৫৪ শতাংশ জলপ্রবাহিত হয়েছে এই বছরে। আমতা খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মাত্র ৪৩৬.৪২ কিউমেক এর জলপ্রবাহ। ডিভিসি বাঁধ নির্মাণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বাম তীরের বাঁধকে সুরক্ষিত করে রেলপথ, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, রানিগঞ্জ খনি অঞ্চল, শিল্পনগরী ও বর্ধমান শহরকে বন্যার থেকে রক্ষা করা। দামোদর নদের ডান পারের দিকে প্রায় ৭৮০ বর্গ কিলোমিটার গ্রামাঞ্চলে অবহেলিত থেকে যায় (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। অপরপক্ষে, বাম তীরের বাঁধকে শক্ত করা হয় যার ফলে প্রায় ১২,৭৪৩ কিউমেক (৪৫০,০০০ কিউসেক) জলপ্রবাহের চাপ সইতে পারে। মাইথন পাঞ্চেত জলাধারের নিচ থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত (২২৯৫ বর্গ কিলোমিটার) এবং দুর্গাপুর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী অনিয়ন্ত্রিত আবহক্ষেত্রে (uncontrolled catchment) প্রায় ৫৬৬৩ কিউমেক (২০০,০০০ কিউসেক)-এর জলপ্রবাহ উৎপন্ন করতে সক্ষম (রেগুলেশন ম্যানুয়াল, ২০০১)।

নিম্ন দামোদর অববাহিকায় যদি অতিবৃষ্টি হয় তাহলে ভূগর্ভের জলস্তর পরিপূর্ণ থাকে, সেই সঙ্গে দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণও ফুলেফেঁপে ওঠে। এই সময়ে হুগলি নদীতে যদি জোয়ারের প্রকোপ থাকে এবং ডিভিসি ও জলাধার থেকে জল ছেড়ে দেয় তা হলে নিম্ন দামোদরে বন্যা হয় প্রবল ভাবে (সেন, ১৯৮৫, ভট্টাচার্য্য,১৯৯৮)।

দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে দামোদর নদে জল নির্গমনের ক্ষমতা অনুকূল অবস্থায় থাকে ৩৬৮১ কিউমেক (১,৩০,০০০ কিউসেক)-এর মতো। কিন্তু অনুকূল অবস্থা না থাকলে তা কমে হয় ২,৮৩২ কিউমেক (১০০,০০০ কিউসেক)(রেগুলেশন ম্যানুয়াল,২০০১)। দামোদরে বাঁধ নির্মাণের পূর্বে ১০,০০০ কিউমেকের বন্যা আসত তিন/চার বছর অন্তর অন্তর। কিন্তু বর্তমানে দুর্গাপুর থেকে মাত্র ২,৮৩২ কিউমেক জল ছাড়া হলেই নিম্ন দামোদর প্লাবিত হয়। সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ ২২৬৬ কিউমেক (৮০,০০০ কিউসেক) অতিক্রম করলেই নিম্ন দামোদর জলমগ্ন হয় (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। ডিভিসি হওয়ার পর নিম্ন দামোদর বন্যাপ্রবণ হয়েছে কথাটা সত্য নয়। নিম্ন দামোদরের নিষ্কাশনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে অকেজো হয়ে গেছে প্রাচীনকাল থেকেই।

জলসেচ ব্যবস্থা : একাল ও সেকাল

ডিভিসি তৈরি হওয়ার আগেও দুর্গাপুর ব্যারেজের মাধ্যমে জলসেচের পূর্বে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের দামোদর নদের পানাগড়ের নিকট অ্যান্ডারসন উইয়ার অর্থাৎ রন্ডিয়া থেকে কাটা খালটির মাধ্যমে জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। রন্ডিয়ার এই খাল থেকে বর্ধমান ও হুগলির প্রায় ৮৯ হাজার হেক্টর (২২০,০০০ একর) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে ডিভিসি-র জলাধারগুলি থেকে ৩.৯৩ লক্ষ হেক্টর (৯,৭৩,০০০ একর) খরিফ-এর জমি ও ৪০.৫ হাজার হেক্টর (১০০,০০০ একর) রবি শস্যের জমিতে জলসেচ করা হয়। ১৯৫৮ সালে দামোদরের জলে১.৮০ লক্ষ হেক্টর (৪৪৬,০০০ একর) জমিতে খরিফ ধানের চাষ হয়েছিল। ১৯৯১ সালে এটি বেড়ে হয় ৩.৩৩ লক্ষ হেক্টর (৮২৩,০০০একর)জমিতে। পরবর্তী কালে তা আরও বেড়ে যায়। ১৯৫৮ সালে রবি চাষ হয়েছিল ১১ হাজার একর অর্থাৎ ৪.৫ হাজার হেক্টর এ, ১৯৯৫-এ বেড়ে হয় ৪১ হাজার একর-এর বেশি অর্থাৎ ১৬.৫৯ হাজার হেক্টর-এ। ডি ভি সি প্রাথমিক পরিকল্পনায় বোরো চাষের কোন চলই ছিল না। বর্তমানে প্রায় ৫৭.৫ হাজার হেক্টর জমিতে অর্থাৎ ১.৪২ লক্ষ একর জমিতে বোরো চাষ হয়।

দামোদর বক্ষে চরের গঠন

রানিগঞ্জের উপর দামোদরের আবহক্ষেত্র হল ১৮৬৭৬ বর্গ কিলোমিটার। দামোদরের বাঁধ নির্মাণের আগে প্রায় ১৮,৪০৮ কিউমেকের জলপ্রবাহ বহন করতে সক্ষম ছিল। প্রবল বন্যার সময় দামোদর প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করত। ১৮৩০-এর পর রানিগঞ্জের নিকট একে একে কয়লা খনিগুলি উন্নতি লাভ করতে থাকে। যদিও ১৭৭৪ সাল থেকেই এই অঞ্চল কয়লা সমৃদ্ধ বলে জানা যায় (হান্টার,১৮৭৭) এই সকল অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনি অঞ্চল ও বনাঞ্চল ধ্বংস করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করত দামোদর এই সময়ে। ১৯১৩ সালের প্রবল বন্যায় দামোদরে ১৮৪০৮ কিউমেক জল প্রবাহিত হয়েছিল। এই প্রবাহের স্থিতিকাল ছিল ১২৩ ঘন্টা। এই সময় প্রায় ৪৪৭৪ কিউমেক জল বর্ধমানের নিকট বাম তীরের বাঁধের ফাটল দিয়ে বাঁকা নালায় প্রবাহিত হয়ে হুগলিতে মিশেছিল। প্রায় ৪৩৫ কিউমেক জল নিচে প্রবাহিত হয়ে বাম তীরের বাঁধের ফাটল দিয়ে উলুবেড়িয়ার কাছে হুগলিতে মিশেছিল। প্রায় ১১৩২৮ কিউমেক জলপ্রবাহ ডানদিকের উন্মুক্ত অংশে উপচে পড়ে বকসি অববাহিকা দিয়ে রূপনারায়ণে পড়েছিল। এই বিশাল জলপ্রবাহের মাত্র ১৪১৬ কিউমেক দামোদর দিয়ে নেমে এসেছিল আমতা খাতে। এই ১৯১৩ সালের বন্যায় দামোদর নিয়ে এসেছিল প্রচুর পলি, যা মাত্র ১৪১৬ কিউমেক এর জলপ্রবাহের দ্বারা প্রবাহিত না হয়ে নদের বক্ষে জমে চরার সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৯-৩০ সালে জরিপ করা SOI (Survey of India) মানচিত্রে প্রায় ৩৫টি ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত চরা দেখা যায়। ১৯৫০-এর দশকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জমিদারেরা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনাঞ্চল ধ্বংস করতে থাকেন। ফলে দামোদরের উচ্চ অববাহিকায় ভূমিক্ষয় শুরু হয় এবং প্রবল বন্যার বছরগুলিতে দামোদরে নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে পলি। ১৯৫৪-৫৭-এর SOI মানচিত্রগুলিতে দেখা যায় দামোদরের চরাগুলির আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংখ্যাও বেড়েছে। ডিভিসি হওয়ার আগে এই চরগুলিতে স্থানীয় লোকেরা গরু চরাত ও মাঝে মাঝে লুকিয়ে তামাক চাষ করত। দুর্গাপুর ব্যারাজ ও মাইথন-পাঞ্চেতে জলাধার নির্মাণের পরে মানুষ এই চরাগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস ও চাষ-আবাদ শুরু করে। দামোদর নদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর এই নদ মানুষের স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা হয়ে গেছে। মানুষ আজ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয়ে আছে দামোদরের বক্ষে।

নদ বক্ষে সভ্যতার বিকাশ

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের পর দলে দলে উদ্বাস্তুরা এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির চরে। দামোদর নদের চর তার একটি প্রকৃষ্ট উদারহণ। দামোদরের মাইথন-পাঞ্চেত জলাধার থেকে হুগলি মোহনা পর্যন্ত সারা দামোদর বক্ষে আজ

তাদের অবাধ আধিপত্য। ধান চাষ থেকে শুরু করে গুটিপোকার পালন সবই হয় নদের চরগুলিতে। এখানে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে ইটখোলা, টালির কারখানা, পানের বোরজ, স্কুল, ক্লাব, খেলার মাঠ, পাকা ও কাঁচা বাড়ি, চাষের খেত ও আরও কত কী। এই দামোদরের কিছু উল্লেখযোগ্য চরা হল বড়মানা, রাঙামাটিয়া মানা, মাঝের মানা ইত্যাদি। বাংলাদেশের লোকেরা এই চরাকেই মানা বলে থাকেন।

বড়মানা

নিম্ন দামোদরে দুর্গাপুর ব্যারাজের নিচে অবস্থিত বড়মানা হল দামোদরের সর্ব বৃহৎ চরা। এই বড়মানা প্রায় ১০.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১.৫ কিলোমিটার চওড়া। প্রায় ১১টি মৌজা বা গ্রামের অংশ নিয়ে বড়মানা গঠিত।

ভূমি-ব্যবহারের ভিত্তিতে বড়মানাকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি অংশকে দেখানো হল যা স্ব-ব্যাখ্যামূলক (চিত্র - ৪)। জঙ্গলাবৃত চরা অঞ্চলটি কিছু দশকের মধ্যে আবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

বড়মানার ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র - ৫)।

১) অঞ্চলটির উত্তর-পুর্ব অঞ্চল ঝোপঝাড় ও ঘাসাচ্ছাদিত।

২) নদের প্রধান ধারাটি দেখা যায় (D1) একদম দক্ষিণ দিকে। উত্তরের ক্ষীণধারাটিতে (D2) চাষ-আবাদ হয় শুখা মরশুমে।

৩) মানুষ গুটিপোকার পালন ও বাড়িঘরগুলি করে থাকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় (৬০ মিটারের ওপরে) বাড়িগুলির লাগোয়া জমিতে তুঁতচাষ করে।

৪) বন্যার জলে প্লাবিত ভূমিগুলিতে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করে।

৫) অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন করা হয়।

৬) বড়মানা চৌহদ্দিতে অননুমোদিত জমিতে শশা, তরমুজ, খেরো ও মেস্তা চাষ করে থাকে।

দামোদর নদ বক্ষে বড়মানা হল নদীবক্ষ সদ্ব্যবহারের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ২৮৩২ কিউমেক বা ৫৬৬৪ কিউমেক জল ছাড়া হলে তাদের কোন্ জমি প্লাবিত হবে এবং কোন্ জমি প্লাবিত হবে না তা গণনা করতে পারে। কোন বছরের প্রবল বন্যায় তাদের কৃষিকার্যের সূচি বাধাপ্রাপ্ত হলে তারা বিচলিত হয় না। এখানে বন্যার ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত। বন্যার ঝুঁকিকে সম্পদ হিসাবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ছোট সময়ে ঝুঁকি নিয়ে তারা বৃহত্তর উপযোগিতা পেয়েছে। নদী বক্ষে বসবাসকারী মানুষ বন্যার সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যেহেতু "বন্যার সঙ্গে থাকার" দৃষ্টিভঙ্গির মূল আকর্ষণ হচ্ছে অস্বাভাবিক বন্যার দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে সাধারণ বন্যার থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলি থেকে উপকৃত হওয়া। এমনকী অন্যান্য নদী উপত্যকার তুলনামূলক খরা-প্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের তাদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় এবং বন্যা কবলিত নদীগর্ভের চরার বাসিন্দারা যেহেতু জলের সুবিধা ভোগ করে, এ ব্যাপারে তাই খরাপ্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের এদের প্রতি যথেষ্ট ঈর্ষান্বিত হতে দেখা যায়। (ভট্টাচার্য্য,১৯৯৪)। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নদী সম্পর্কেও এই একই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়।

নদ বক্ষে বসবাসকারী স্থানীয় তফসিলি শ্রেণীর মানুষের বন্যার ঝুঁকি কমানোর জন্য অস্থায়ী ভাবে কম বিপজ্জনক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় অথবা যদি আর্থিক ভাবে সক্ষম হয় তা হলে তারা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে যায় অথবা বন্যার সময় সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেই একই গোষ্ঠী যখন ছিন্নমূলের মত অন্য জায়গার থেকে এসে নদ বক্ষে বসবাস করতে শুরু করে তখন তারা ভিক্ষাজীবী জীবনের চেয়ে নদ বক্ষের ওই অঞ্চলে নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৯)।

পশ্চিমবঙ্গে স্থান সঙ্কুলান-এর জন্য প্রথম থেকেই তারা দামোদর বক্ষে থাকতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে নদবক্ষকে তারা অনেক বেশি সম্পদশালী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। দামোদর নদবক্ষ এখন

বিপজ্জনক না হয়ে সম্পদশালী হয়ে উঠেছে (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৫, ১৯৯৭)। কিন্তু অপরপক্ষে নদ গর্ভে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জল পরিবহণের জায়গা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে।

মূল্যায়ন ও প্রস্তাবনা

● বাঁধ নির্মাণের প্রাক্কালে ১০,০০০ কিউমেকের বন্যা আসত প্রতি তিন/চার বছর অন্তর অন্তর। পরবর্তী কালে সেই ১০,০০০ কিউমেকের জলপ্রবাহ কদাচিৎ-ই দেখা গেছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে পরিকল্পিত বন্যার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

● বাঁধ নির্মাণের আগে স্বাভাবিক বন্যা এসেছে ১১ বার। পরবর্তী কালে সেই স্বাভাবিক বন্যা এসেছে মাত্র তিনবার। বাঁধ নির্মাণের ফলে সাবনর্মাল বন্যা বেড়ে গিয়েছে বাইশ বারে।

● বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী কালে ১৮,৪০৮ কিউমেক এর বন্যাকে ৭০৮০ কিউমেক-এ কমিয়ে আনা হলেও নিম্ন দামোদরের নিম্নাংশে সেই জলপ্রবাহ সহনীয় নয়। নিম্ন দামোদরের নিম্নাংশে জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে নদের ডানপাড়-এর বাঁধ ভেঙে দেওয়ার পরবর্তী কাল থেকেই।

● বাঁধ নির্মাণের আগে দামোদরের অববাহিকার মানুষ পলি সমৃদ্ধ জলকে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করত। জলাধার নির্মাণের ফলে সেই আধাতরল সম্পদটি চরারূপ স্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে।

● মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে হুগলি মোহনা পর্যন্ত দামোদর নদবক্ষে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

● দামোদর নদবক্ষে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জলপরিবহণের জায়গা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে। নদের বহন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

● বাঁধ নির্মাণের ফলে শুখা মরশুমে সেচ এবং সারা বছর শিল্পে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরপক্ষে নদবক্ষে মানুষ অতিফলনশীল শস্যের চাষের জন্য ভৌমজলকে অত্যধিক মাত্রায় টেনে তোলায় ভূমি প্রবাহ (base flow) কমে গিয়েছে।

বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় বাঁধ নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল জলাধারের উদ্দেশ্য কখনোই একাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জল সংরক্ষণ হতে পারে না। এই লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার ভাব আছে। বাঁধের উদ্দেশ্য যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয় তবে সব সময়ই বাঁধটি যথাসম্ভব খালি রেখে অনেক বেশি বন্যার জল আটকে রাখতে হবে। অপরদিকে জলসেচ করার জন্য বাঁধের জলের স্তর যথাসম্ভব উঁচুতে রাখা দরকার। বাঁধ হওয়ার আগে বন্যা হত স্বাভাবিক কারণেই আষাঢ়-শ্রাবণে। সেই বন্যা নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভাদ্র-আশ্বিনে। আমাদের জলচক্র অনুযায়ী বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করে জুলাই-অগাস্টে। সেপ্টেম্বরে মাটি সুসিক্ত থাকায় বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করতে না পেরে ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যায় নদীতে। জুলাই-অগাস্টে জলাধার থেকে জল ছাড়া হলে বিপদ হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। কিন্তু জল ছাড়া হয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। কৃষকদের কাছে সেপ্টেম্বরের ২৫ থেকে অক্টোবরের ১০ তারিখ ধানচাষের জন্য জলের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই সময়ে যদি প্রবল বর্ষণ হয় এবং জলাধার থেকেও জল ছাড়া হয় তা হলে বন্যা অবশ্যম্ভাবী। (ভট্টাচার্য্য,১৯৯৮,২০০০)। বোরো চাষের জন্য জলসেচের পরিমাণ কমিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জলাধারের জল জুন-জুলাই-এ যদি মানুষকে বিপদ সংকেত দিয়ে চকিত বন্যার (flash flood) মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে নিম্ন দামোদরের বন্যার প্রকোপ কমানো যাবে। নয়তো মানুষকে বন্যার সঙ্গে মানিয়ে থাকতেই হবে।

দামোদরকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য। দামোদরের বাঁধ নিয়েই দামোদর - এর পরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা যেতে পারে।

● দামোদরের বাঁধের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। বাঁধগুলিতে বৃক্ষ রোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

● দামোদরে একটি স্থায়ী প্রবাহ যাতে থাকে তার চেষ্টা করা উচিত। ডি ভি সি-র রিপোর্ট-এ (১৯৫৭) চকিত

বন্যার প্রস্তাব আছে। কিন্তু, নিম্ন দামোদরের নিষ্কাশন প্রণালীর সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে তা কার্যকর হয়নি। নিম্ন দামোদরের নিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি সাধন করে জুলাই-অগাস্টে ২৮৩২-৩৬৮২ কিউমেকের (১০০,০০০ থেকে ১৩০,০০০ কিউসেক) চকিত বন্যা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

● দামোদরের পরিত্যক্ত খাতের সংস্কার এবং মূল নদের সঙ্গে তাদের সংযোগ সাধন করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

●তেনুঘাটে বাঁধ নির্মাণের পর পাঞ্চেতে পলি সঞ্চয়ের হার কমে গেছে। সেরূপ, পাঞ্চেত ও মাইথনের জমি অধিগ্রহণ করা ছাড়াও বলপাহাড়িতে বাঁধ নির্মাণ করে মাইথনের পলি সঞ্চয়ের হার কমিয়ে জলাধারগুলির আয়ু বাড়ানো সম্ভব। এরই সঙ্গে সেই প্রাচীন প্রথায় পুকুর বা চেক বাঁধ করে বৃষ্টির জল ও পলি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরই সঙ্গে উচ্চ অববাহিকায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ খুবই জরুরি।

● নদ গর্ভে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জল পরিবহণের জায়গা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। স্থায়ী চরা বাদ দিয়ে সক্রিয় নদবক্ষ মানুষের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন।

● আমতা ও মুণ্ডেশ্বরীর জন্য আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে ৭০৮০ কিউমেক জল হুগলি মোহনা পর্যন্ত বার করে দেওয়া যায়।

আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যুক্তিসম্মত উপায়ে জলসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আমাদের সভ্যতাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় — economic development can be sustained as an ongoing process only if the riverine regime is ecologically sound and socially just (Saha et al, 1981). G. P. Marsh (১৮৫৪) অনেকদিন আগেই যে সাবধান বাণী দিয়ে গেছেন তা দিয়েই এই নিবন্ধটির ইতি টানা যেতে পারে। উনি বলেছেন —Man is a dynamic force, often irrational in his treatment of the environment. Because of his irrationality man creates danger to himself that he will destroy his base of subsistence.

কৃতজ্ঞতা : অধ্যাপিকা মঞ্জুশ্রী বসু, ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়;
শ্রী মানস কুমার ভারতী, নির্বাহী বাস্তুকার, দুর্গাপুর হেডওয়ার্কস; সেচ ও জলপথ দপ্তর;
শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, এস. ডি. ই (সিভিল), ডিভিসি, কলকাতা;
শ্রী বিশ্বমোহন গোস্বামী, নির্বাহী বাস্তুকার, ডিভিসি, মাইথন।

References:

1. Ali, S.M. (1966): *The Geography of the Puranas*. People's Publishing House, N.Delhi.
2. Basu, A. K. (1889): *Ganga Pather Etikatha* (History of Ganges, in Bengali). West. Bengal. State Book Board, cal: 35-36.
3. Basu, M.and Bhattacharyya, K. (1992): Flood Disaster reduction measures in the Lower Damodar West Bengal, India, (Abstr), Abstr. *International Symposium of Flood Disaster Reduction in Southeast Asia*, Waseda University, Tokyo, Nov10-11.
4. Bera, S (1982): *Nadi Bignyanyer Katha* (Science of River in Bengali), Calcutta.
5. Bhattacharyya, Kapil. (1959): *Bangla Deshar Nad-Nadi O Parikalpana* (River planning of Bengal in Bengali) Bidyodaya library Pvt. Ltd. Cal. 69-87, also reprinted in part Utsa Manus 1990: 46-48.
6. Bhattacharyya, K. (1994): Water resource management in flood prone water shed re-

gion of micro order- a case Study of Kaliaghai-Kangsabati Watershed, *Journal of the Indian Geographical Foundation*, 1, 66-73.
7. Bhattacharyya, K. (1995): Short-term vs long term impacts of river control structures on a flood-prone tropical river- a study in the upper sector of the lower Damodar, a sub-system of the Ganga River, *India*, (Abstr.), Abstr. *3rd S. E. Asian conference of the International Association of Geomorphologists*, National University of Singapore and Nanyang Technological University, Singapore, Jun 18-23, 31.
8. Bhattacharyya, K. (1997): Human perception and adjustment in the riverine sand bars: a case study of the Lower Damodar river, India, (Abstr.), Abstr. *4th International conference of Geomorphologists*, Bologna, Italy, 28Aug - 3 Sep, 79.
9. Bhattacharyya, K (1999): Floods, flood hazards and hazard reduction measures: A model-The case in the Lower Damodar River, *Indian Journal of Landscape Systems and Ecological Studies*, 22,1,57-68.
10. Bhattacharyya, K (1999): *Nikhut Parikalpanai Damodar ke Bachante Pare* (Proper Planning Can Save Damodar in Bengali), Bartaman, 17th Oct, 4.
11. Bhattacharyya, K (1999-2000):Impact of lateral control structures- A case in the Lower Damodar River, *Journal of Indian Geographical Foundation*, 5 & 6, 82-100.
12. Bhattacharyya, K (1999-2000): Dams and some related issues – the case in the Lower Damodar River, *Journal of Indian Geographical Foundation*, 5 & 6, 101-119.
13. Bhattacharyya, K (2001): Floods: resource or hazard- A case study in the Lower Damodar River, India, Abstr., submitted, *IWHA conference*, 10-12 August 2001, Centre for Development studies (CDS), University of Bergen, Norway.
14. Biswas, A. and Bardhan, S. (1975): Agrarian crisis in Damodar - Bhagirathi region 1850-1925. *Geogr. Rev. Ind.*, 37 (2), 132-150.
15. D.V.C: Damodar Valley Corporation. (1997): *Sedimentation survey of Panchet Reservoir*, Maithon, 25pp.
16. D.V.C: Damodar Valley Corporation. (1995): *Data book*, D.V.C, Cal, 62pp.
17. D.V.C: Damodar Valley Corporation. (1994): *Sedimentation survey of Maithon Reservoir*, Maithon, 24pp.
18. D.V.C: Damodar Valley Corporation. (1978): *D.V.C. and its Flood Control Capacity, Past, Present and Future*. D.V.C, Cal., 28pp
19. D.V.C: Damodar Valley Corporation. (1957): *Report of the Lower Damodar Investigation Committee*, D.V.C, Cal., *1*, 18pp.
20. Ghosh, T. (1993): *Nimna Damodar Anchal Barbar Banya Bhase Keno* (why the Lower Damodar region is so flood prone., in Bengali), Dainik Pratibedan, Issue dated 13-16 Sept., 4.
21. Hunter, W.W. (1876): *A Statistical Account of Bengal*. 4, Trubner and Co. London. 209-210.
22. Hunter, W.W. (1877): *A Statistical Account of Bengal*. 4, Trubner and Co. London.109, 141.
23. Marsh, G.P. (1864): *Man and Nature, or Physical Geography Modified By Human Action*. Reprinted, 1965 Harvard University Press, Cambridge, Mass.
24. Mitra, S. (1948): *Hooghly Jelar Itihas* (The History of Hugli district in Bengali), Sisir Pub. House, Cal. 66-89.
25. O' Malley, L S.S. and Chakravarti, M. (1912): *Bengal District Gazetteers* (Hooghly). Bengal Secretariat Book Depot. Calcutta. 159-166.

26. *Regulation Manual For Damodar Valley Reservoirs* (2nd Ed), 2001: Central Water Commission, Ministry of Water Resources, Govt. of India.
27. Ricketts, H. (1853): *Note on the Management of the Embankment, Bengal Govt. Selections. No.12*. Bengal Military Orphan Press, Cal. 1-12.
28. River Revival, 2000. *River Revival Bulletin, No 22, Nov 29, 2000*, International River Network, Berkeley, USA.
29. Sage, Wm., Simms, F.W. and M'Clelland, J. (1846): *Report on the Embankments of the Rivers of Bengal.* Military Orphan Press, Cal. 13.
30. Saha, M. (1944): Planning for the Damodar Valley. *Science and Culture*, 10,20. reprinted in Damodar Valley: Evolution of the Grand Design. D.V.C. 1992. 239-256.
31. Saha, S.K. and Barrow, C.J.1981 *Introduction*, in Saha and Barrow (eds), River Basin Planning Theory and Practice, Wiley, Chichester, 1-7.
32. Sen, P.K. (1985): The Genesis of flood in the Lower Damodar Catchment (with a case study of the September- October, 1978 flood). In: Sen, P.K. (ed.) *The Concepts and Methods in Geography. Institute of Geography*, Dept. of Geography. The Univ. of Bardwan, West Bengal. 71-85.
33. Sen, S.K. (1962): *Drainage Study of Lower Damodar Valley*. D.V.C. Publication. Calcutta. 65pp.
34. Voorduin, W.L. (1947): *Preliminary Memorandum on the Unified Development of the Damodar River*. Central Technical Power Board., Cal.
35. Willcocks, W. (1930): *The Overflow Irrigation of Bengal, Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal and its Application to Modern Problems.* Calcutta University. Calcutta.
36. World Commission on Dams, 2000. *Dams and Development*, A Report of the World Commission On Dams, www.wcd.org

দামোদর উপত্যকা : নিরীক্ষিত অঞ্চল
রাজ্য সীমা
জেলা সীমা
খাল, নদী
রেল পথ
বর্ধমান
বাঁকুড়া
হুগলি
হাওড়া
কলকাতা
দুর্গাপুর
রানিগঞ্জ
আসানসোল
বাঁকুড়া
দামোদর উপত্যকা
১০০কিমি

চিত্র - ১

দামোদরের পথ পরিবর্তন

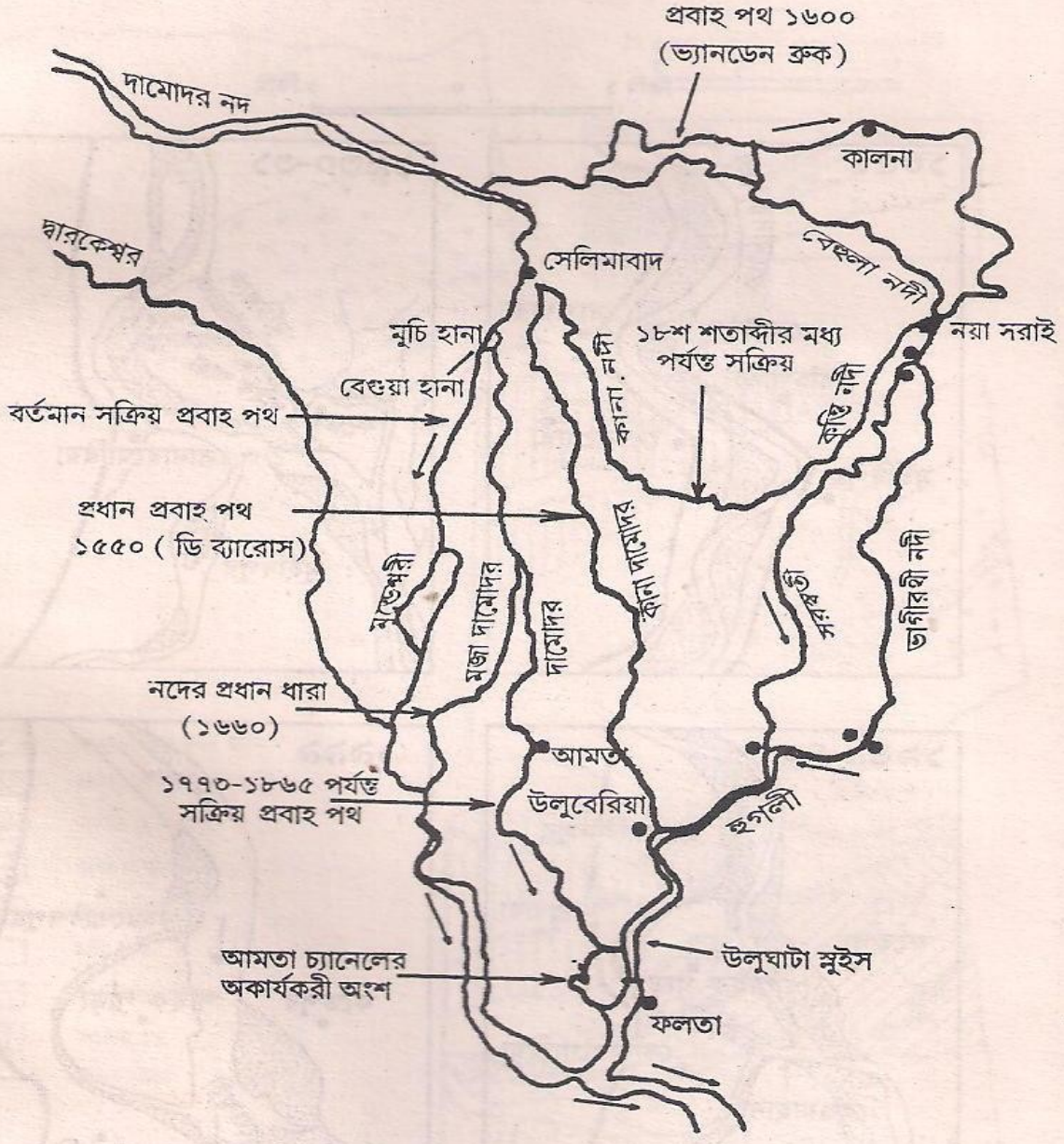

উৎস : বসু ১৯৮৯; ভট্টাচার্য্য ১৯৯৮

চিত্র - ২

বেগুয়াহানা-র উদ্ভব

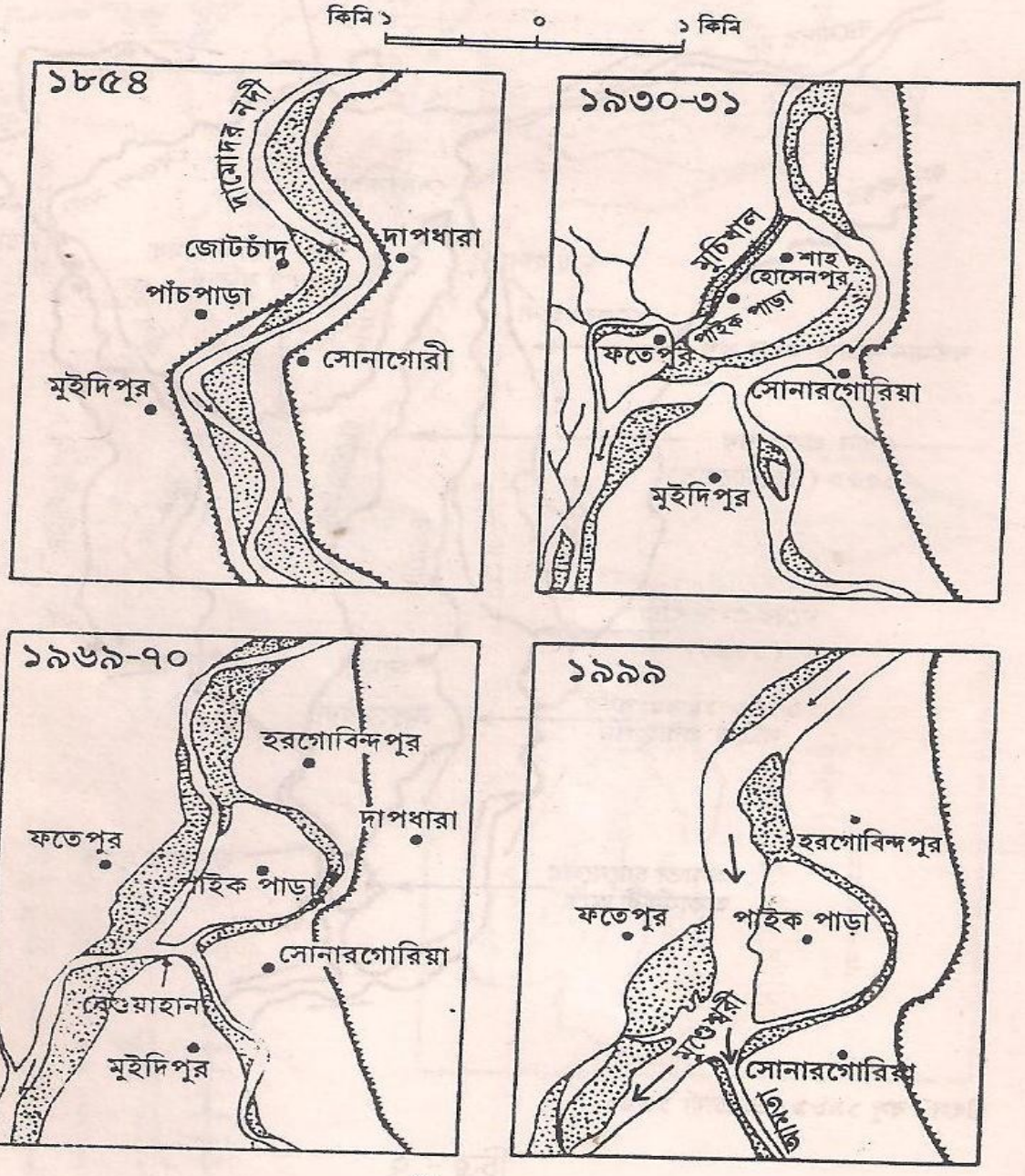

চিত্র - ৩

বড়মানা-য় (অংশ - ১ এবং ২)
সাধারণীকৃত ভূমি ব্যবহার ও ভূচিত্রের পরিবর্তন
(বামনডিহি ও পুরাকোন্ডা মৌজা)

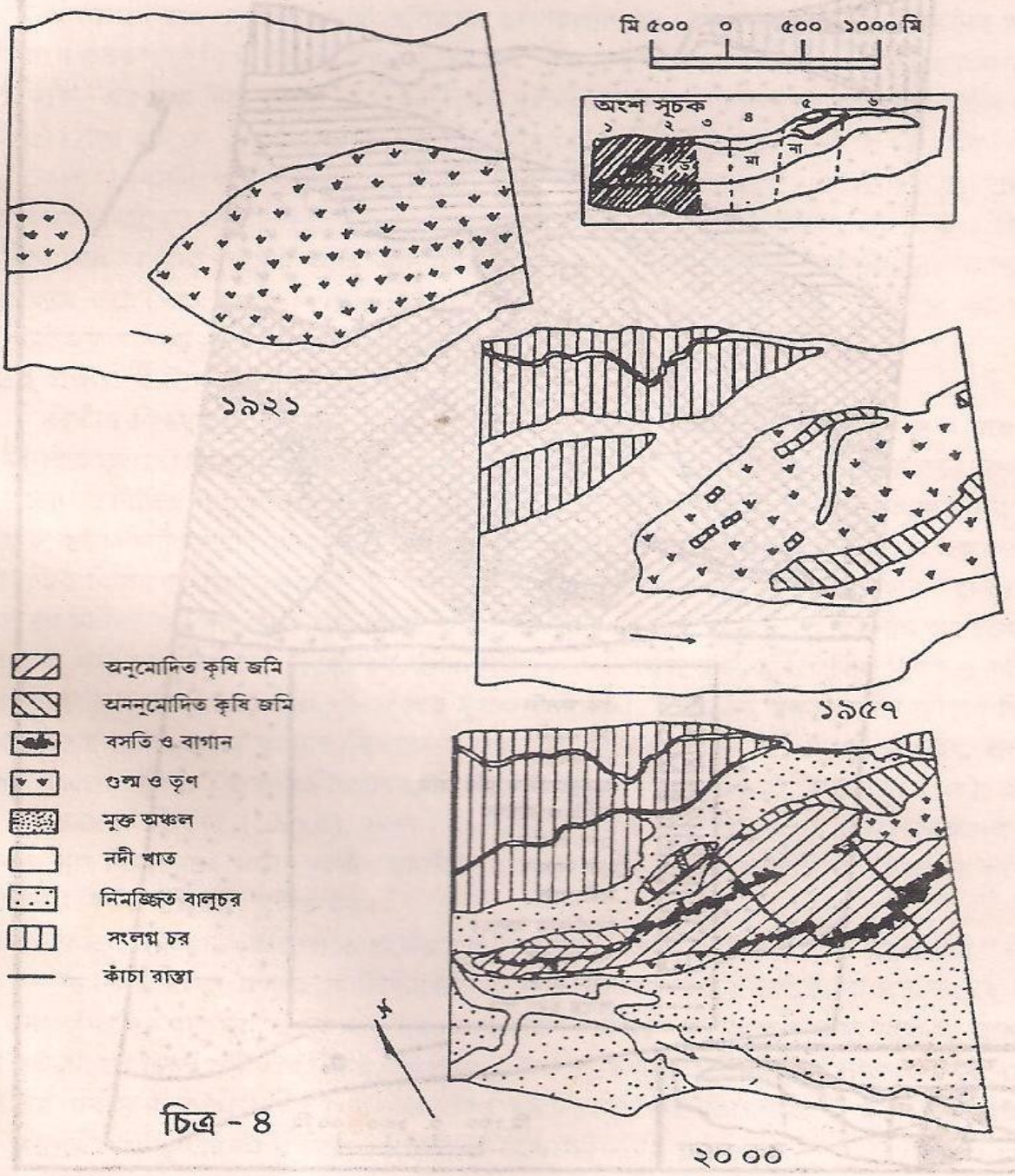

চিত্র - ৪

বড় মানা-য় (অংশ-২) ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যাবলি
(পুরাকোন্ডা মৌজা)

চিত্র - ৫